কৃষ্ণকান্তের উইল

(চরিত্রালোচনা)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এম. এ.
প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
১৯৪১

উৎসর্গ

যাঁহার গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে

তাঁহারই পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

এই ভক্তি-অর্ঘ্য

প্রদত্ত হইল।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

কৃষ্ণকান্তের উইল প্রকাশিত হইবার পরে অনেকে রোহিণীর-হত্যা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন—"অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'রোহিণীকে মারিলেন কেন?' অনেক সময়ে উত্তর দিতে বাধ্য হইয়াছি—'আমার ঘাট হইয়াছে।' কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য-জীবনের কঠিন সমস্যা-সমূহের ব্যাখ্যা মাত্র। একথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস-পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলে বাধ্য হই।" ইহা গ্রন্থকারের নিজের উক্তি। গ্রন্থ-সমাপনান্তে যখন রোহিণীর হত্যা-সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তখনও গ্রন্থকার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। রোহিণীর চিত্র তিনি পরে নানাভাবে পরিবর্ত্তিত

করিলেও উক্ত প্রকার আপত্তি সত্ত্বে হত্যা-ব্যাপারের কোনই পরিবর্ত্তন করেন নাই। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার ইহা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরেও এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে অনেকে সমালোচনা করিয়া রোহিণীর হত্যা-ব্যাপারে গ্রন্থকারকে অপরাধী কল্পনা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু বঙ্কিম অবিচলিতভাবে যাহা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে চেষ্টা করাই সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। গ্রন্থকারকে না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিলে ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়। বর্ত্তমান আলোচনায় বঙ্কিমকে বুঝিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। আমি ক্ষুদ্রব্যক্তি, কিন্তু আমা অপেক্ষা যাঁহারা জ্ঞানে ও প্রতিভায় অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠস্থানীয় এবং আমার নমস্য, তাঁহাদের সহিত একমত না হইতে পারিয়া আমি নিজেকে নিতান্তই হতভাগ্য মনে করিতেছি। এই জন্য হয়ত আমার অপরাধ হইয়া থাকিবে, কিন্তু প্রত্যেকেরই দৃষ্টি-ভঙ্গী বিভিন্ন রকমের। অতএব কোন গ্রন্থ-সমালোচনায় বিভিন্ন মতবাদের একটা সার্থকতা আছে। এই

উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই এই ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আশা করি—ইহাতে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না।

বিনীত—

গ্রন্থকার

কৃষ্ণকান্তের উইল

গোবিন্দলাল ও রোহিণী

কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলাল নায়ক, ভ্রমর নায়িকা, এবং রোহিণী ভ্রমরের প্রতিনায়িকা। রসশাস্ত্রে প্রতিনায়কের ন্যায় প্রতিনায়িকার পরিকল্পনাও রহিয়াছে (হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসন, বোম্বাই, ৩০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। প্রতিনায়কগণ সাধারণতঃ লুব্ধ, ধীরোদ্ধত, পাপক্রিয়াসক্ত এবং রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া থাকে (দশরূপ, ২।১৫)। রামচন্দ্রের প্রতিনায়ক রাবণ, এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতিনায়ক দুর্য্যোধন ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থানীয়। প্রতিনায়িকাগণেও এই সকল বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়। কপালকুণ্ডলা-গ্রন্থে মতিবিবি ইহার দৃষ্টান্ত-স্থানীয়া। আবার রসশাস্ত্রে স্বকীয়া, পরকীয়া ও সাধারণী এই তিনপ্রকার নায়িকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় নায়কের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমই পরকীয়া

নায়িকার বিশেষত্ব (উজ্জ্বলনীলমণি, বহরমপুর সং, ৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এইজন্য ভাগবত-বর্ণিতা কুব্জা সৈরিন্ধ্রী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতিবশতঃ পরকীয়া নায়িকা রূপেই স্বীকৃতা হইয়া আসিতেছেন (ঐ, ১৪৭ পৃঃ)। "বিষবৃক্ষে" কুন্দনন্দিনী ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু যাহারা কাম বা অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া বহুপুরুষের মনোরঞ্জন করে, তাহারাই সাধারণী নায়িকার পর্য্যায়ভুক্তা। ইহারা মূলতঃ সামান্যা নায়িকারূপে গণ্যা হয়। এখন দেখিতে হইবে যে, কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে কোন্ জাতীয়া নায়িকা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

রোহিণীর সহিত প্রথম সাক্ষাতে আমরা দেখিতে পাই—"রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল, শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ—সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।" এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় গ্রন্থকার আমাদিগকে রোহিণীর সম্বন্ধে

সজাগ করিয়া দিলেন। যৌবনের অধিকারিণী হওয়া অবশ্যই রোহিণীর পক্ষে অস্বাভাবিক হয় নাই, কারণ গঙ্গার জোয়ারের ন্যায় যৌবন যথাকালেই আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা বিধাতার সৃষ্টি-রক্ষার কৌশল মাত্র। আর রোহিণী যে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, এই উক্তির হেতু নির্ণয় করিতে যাইয়া আমরা গ্রন্থকারকেই বিধাতার আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাই। রোহিণীর চরিত্রের পটভূমি রূপে বঙ্কিম এই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহের বিষময় ফল প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি রোহিণীর বৈধব্যের পরিকল্পনা করিয়াছেন, ইহা এই গ্রন্থ সমালোচনায় বলা যাইতে পারে না, কারণ গ্রন্থমধ্যে রোহিণীর সহিত কাহারও বিবাহ সংঘটিত হয় নাই। ইহা-দ্বারা তাহার অভাবের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে—ভোগে সে বঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু বিধবা রোহিণীর সম্বন্ধে আমাদের মন প্রথম সজাগ হইয়া উঠে, যখন আমরা দেখিতে পাই যে, ষোলকলায় পরিপূর্ণ শরতের চন্দ্রের ন্যায় তাহার রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল! রূপ জগতে জল বায়ু

আকাশের ন্যায় সুলভ নহে, কারণ ভগবান সকলকে সমান রূপের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করেন না। অধিকন্তু ইহা ঐশ্বর্য্যস্থানীয়। ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব আছে, এবং ইহা অপরকেও প্রলোভিত করে। এই উভয়বিধ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চাই অপরিমিত হৃদয়-বল। রোহিণীর তাহা আছে কি না, এই প্রশ্নই আমাদের মনে প্রথম উদিত হইয়া থাকে। তারপর যখন আমরা দেখিতে পাই যে,—“বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত”, তখনই আমাদের হৃদয়ে প্রথম সন্দেহের রেখাপাত হয়। মানুষ সামাজিক জীব। যে দেশেই সে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, কোন না কোন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই তাহাকে বাস করিতে হয়। সেই সমাজের বিধি ব্যবস্থা যাহারা মানিয়া চলিতে পারে না, তাহাদের মনেই বিদ্রোহের ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহ মূলতঃ দুর্ব্বলতা-জাত। বালবিধবার পক্ষে ইহার পরিণতি অতীব শোচনীয়ই হইতে পারে।

গোবিন্দলাল ও রোহিণী

কবি রোহিণীকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াই অতি সংক্ষেপে এবং সুকৌশলে তাহার দুর্ব্বলতার আভাস দিয়া আমাদিগকে উৎকণ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর রোহিণীর সহিত আমাদের দেখা হয় হরলালের উইল চুরির ব্যাপারে। রোহিণী রাঁধিতেছিল, হরলাল আসিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, একদিন সে তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, আজ তাহারই প্রতিদানে সে রোহিণীকে উইল চুরি করিতে অনুরোধ করিয়া বসিল। শুনিয়া রোহিণী বলিল—"চুরি? আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।" হরলাল তাহাকে হাজার টাকার লোভ দেখাইল, কিন্তু রোহিণী তাহাতেও টলিল না। অবশেষে হরলাল তাহার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। রোহিণীকে বলিল যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, অতএব রোহিণীও একটা বিবাহ করিতে পারে। তৎপর সে স্পষ্টভাবেই বলিল—"তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম-সুবাদ মাত্র, সম্পর্কে বাধে না।" রোহিণী পরাজয় স্বীকার করিল, জাল উইল

রাখিয়া দিল, কিন্তু টাকা লইল না। এই একটি মাত্র ঘটনায় রোহিণী-চরিত্রের বিশেষত্ব স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রোহিণীকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় হরলালের ছিল না। ব্রহ্মানন্দের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে রোহিণীকে অবলম্বন করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিল। একটা গোলাপকে বৃন্তচ্যুত করিতে কিছু আয়াসের প্রয়োজন হয়, কিন্তু হরলাল দেখিল যে, রোহিণীকে বিচলিত করিতে আন্তরিকতাহীন একটা মুখের কথাই যথেষ্ট! ইতিপূর্ব্বে হরলাল আসিয়া রোহিণীর নিকটে কখনও প্রেম নিবেদন করে নাই। তারপর উইল চুরির ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইল, তাহাতে কাজের কথাই মুখ্য, বিবাহের প্রসঙ্গ গৌণ। অতএব এই মূল্যে বিক্রীত হইতে স্বীকৃত হওয়া রোহিণীর পক্ষে প্রশংসার বিষয় হইয়াছে কি? অবলম্বনহীন জীবন যাপন করা অপেক্ষা বিবাহ করিয়া স্থিতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যে রোহিণী ইহা করিয়াছিল, তাহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ বিবাহ-বন্ধনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে আন্তরিকতা ও প্রীতির উপরে।

হরলালের প্রস্তাবে যে ইহার কিছুই ছিল না, তাহা বুদ্ধিমতী রোহিণীর বুঝিতে না পারা আত্মপ্রতারণা মাত্র। আবার তাহার নিজের দিক্ দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, হরলালের প্রতি তাহার অণুমাত্রও ভালবাসা ছিল না। এই অবস্থায় স্থায়িত্বের পরিকল্পনা বাতুলতা মাত্র। এই ঘটনার উপসংহারেও ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। রোহিণী উইল চুরি করিল বটে, কিন্তু যেই হরলাল তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইল, অমনি রোহিণী তাহাকে ঝাঁটা দেখাইয়া বিদায় করিয়া দিল। বিবাহের অভিনয়ের এই ভাবেই পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। ভাল না বাসিয়াও যে সকল নায়িকা এইরূপ কাচমূল্যে আত্মবিক্রয়ে দ্বিধা বোধ করে না, রসশাস্ত্রে তাহাদিগকেই সামান্যা বলা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে এই পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াই গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

এখন রোহিণীর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের হেতু কি, ইহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। রসশাস্ত্রে শৃঙ্গার, বীর, করুণ প্রভৃতি বিবিধ কাব্যরসের উল্লেখ রহিয়াছে। রসের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে

যাইয়া পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—আমাদের হৃদয়ে কতকগুলি ভাব সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। যখন কোন বাহ্যিক উত্তেজনায় তাহারা জাগরিত হইয়া আস্বাদনীয় রূপে অনুভূত হয়, তখন মনে যে আনন্দের উদয় হইয়া থাকে, তাহাই রস। রূপযৌবনসম্পন্না রোহিণীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কবি আমাদিগকে যতটুকু দিয়াছেন তাহাতে তাহার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অতি সামান্যই আমরা জানিতে পারি। কিন্তু তাহার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, যৌবন-সুলভ মিলনের আকাঙ্ক্ষা গুপ্তভাবেই তাহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিল, হরলালের উত্তেজনায় তাহা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। গুহাভ্যন্তরস্থিতা আত্ম-বিস্মৃতা নির্ঝরিণী আজ লোভনীয় গানে এক বিচিত্র জগতের সন্ধান পাইয়া ভোগলালসায় উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই জাগরণের জন্য দায়ী কে? দায়ী প্রকৃতপক্ষে হরলাল। কারণ সে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় করিয়া রোহিণীর দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিতে গিয়াছিল জগতে অবশ্য সকলেই স্বার্থান্বেষী, কিন্তু নিজের

প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত গর্হিত উপায় অবলম্বন করা যে নীতি-বিরুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। হরলালের উদ্দেশ্য গোবিন্দলালকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা। উইল চুরির ব্যাপারে সে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিল বটে, কিন্তু রোহিণীকে উত্তেজিত করিয়া সে গোবিন্দলালের যে অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়া গেল, তাহাতে শুধু গোবিন্দলালের নহে, রোহিণী ও ভ্রমরের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল, এবং কৃষ্ণকান্তের সোনার সংসার ধ্বংস হইয়া গেল। বংশে কুপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহার ফল এইরূপই ভীষণ হইয়া থাকে।

এইত গেল হরলালের দায়িত্ব সম্বন্ধে, কিন্তু রোহিণীর কি কোনই দোষ নাই? বালবিধবা রোহিণীর যৌবন সমাগমে মনে যদি আসঙ্গলিপ্সার উদয় হইয়া থাকে, তাহাতেও তাহাকে দোষী করা যায় না, কারণ যৌবনে এইরূপ মনোবৃত্তির বশীভূত হওয়া রোহিণীর পক্ষে অস্বাভাবিক হয় নাই, যেহেতু সৃষ্টি রক্ষার জন্য বিধাতার বিচিত্র বিধানে সকলেই এই কালোচিত প্রভাবের অধীন হইয়া থাকে। তবে রোহিণীর দোষ কোথায়? এই

প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া আমরা প্রথমেই তাহার মনোবলের অভাব লক্ষ্য করি। বাসনা সকলের মনেই উদিত হয়, যাহারা ইহার বেগ রোধ করিতে পারে না, জগতে তাহারাই পাগল, যাহারা সময় সময় কিঞ্চিন্মাত্র প্রশমিত করিতে পারে, তাহারা হয় দুষ্কৃতকারী, যাহারা ইহাদিগকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া কার্য্য করিয়া যাইতে পারে সংসারে তাহারা সৎলোক বলিয়া পরিচিত হয়, আর যাহারা ইহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে দমন করিতে পারে তাহারাই মহৎ। অতএব লোকের ভাল-মন্দ নির্ভর করে তাহার হৃদয়বলের তারতম্যের উপর। রোহিণীর মনেও যে ভাব জাগরিত হইয়াছিল, সে যদি তাহার প্রসার সীমাবদ্ধ রাখিতে পারিত, তাহা হইলে কোনই অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পর্য্যাপ্ত হৃদয়-বলের অভাবে সে বাসনার স্রোতে বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। এই দুর্ব্বলতাই রোহিণীর দোষ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই রোহিণীর এই দুর্ব্বলতার আভাস দিয়া গিয়াছেন। তখন রোহিণী সম্বন্ধে আমাদের মাত্র সন্দেহ জাগরিত

হইয়াছিল, এখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, রোহিণী সাধারণী নায়িকা মাত্র, তদুপরি তাহার হৃদয়বলের অভাব রহিয়াছে এবং ভোগতৃষ্ণাও জাগরিত হইয়াছে। ইহার ফলে যে কৌশলে সে উইল চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকারই বলিয়াছেন—"রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই।" অর্থাৎ যাবতীয় দোষের সমষ্টিতে গঠিত করিয়া তিনি রোহিণীকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে এখন ইহার পরিণতি বর্ণিত হইবে।

স্বপ্নভঙ্গে নির্ঝরিণী কবির ভাষায় বলিয়া উঠিয়াছিল—

"না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!"

রোহিণীও এই নব জাগরণে উজ্জ্বলাখ্য ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরের সন্ধান পাইয়া প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতেছে। এখন সে কলসী কক্ষে বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়, এবং কোকিলের কুহুস্বরে চমকিয়া উঠে। কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত এই সময়ে রোহিণীর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ

করিয়া দেখাইয়াছেন। কোকিল ডাকে বটে, কিন্তু সকল সময়ে সেই ডাক সকলের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে না। রোহিণীও জীবনে কোকিলের ডাক এই নূতন শুনিতেছে না, কিন্তু ডাক শুনিয়াই এখন তার মনে হয়—"কি যেন হারাইয়াছি, যেন তাই হারাইয়া যাওয়ায় জীবন-সর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে, যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কি যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি, কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ-জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।"

কোন রসিক লিখিয়াছেন—

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

রোহিণীও এখন আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র এই ব্যাকুলতার সুর অনুভব করিতেছে। "সে চাহিয়া দেখিল সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—

প্রস্ফুটিত আম্রমুকুল কাঞ্চন গৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুণগুণে শব্দিত। অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা।" রোহিণী ইহাতে মজিল, এবং "সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।" আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, অথচ তৃপ্তির উপায় নাই! ক্রন্দনেই ইহার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। যখন রোহিণীর মন এইরূপে উদ্বেলিত হইতেছিল, তখন ধীরে ধীরে গোবিন্দলাল তাহার সন্নিহিত হইতে লাগিল। গ্রন্থকার এই সময়ের ঘটনাগুলি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া অতি নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। রোহিণী দিবাবসানে বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে গিয়াছিল। গোবিন্দলাল কুসুমিতা লতার অন্তরাল হইতে দেখিল যে, রোহিণী আসিয়া ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে,—"তাহার অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতেপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুবিনির্ম্মিতা কাল ভুজাঙ্গিণী-তুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনো-মোহিনী কবরী।" কালিদাস অনুরূপ পরিস্থিতিতে

পার্ব্বতীকে মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তখন বাণাহত শিবের নয়নাগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হইয়াছিল, কিন্তু উক্তরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিতা রূপবতী রোহিণীকে একা ঘাটের উপর উপবিষ্টা দেখিয়া গোবিন্দলাল কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত হইল না, বরং সিদ্ধান্ত করিল যে,—"রোহিণী পাড়ার ছেলে মেয়েদের সহিত কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে।" হায় গ্রন্থকার! অঘটন ঘটাইবার এমন উৎকৃষ্ট সুযোগ বৃথায় চলিয়া গেল! কিন্তু এখানে তিনি গোবিন্দলালের চরিত্রের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন। ভ্রমর-প্রেমপরিতৃপ্ত গোবিন্দলালের অন্তরে যে প্রতিবেশী কন্যা রোহিণীর রূপ-যৌবন-সাজ-সজ্জা কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, এখানে আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করিলাম। শুধু তাহাই নহে, রোহিণীর ক্রন্দনকেও উপেক্ষা করিয়া সে উদ্যান-ভ্রমণে চলিয়া গেল। এইরূপে রোহিণীর প্রথম আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছিল।

তারপর সূর্য্য অস্ত গেলে, চন্দ্র উঠিল। উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে যাইবার পথে গোবিন্দলাল

দেখিল যে, রোহিণী তখনও ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে। "দেখিয়া তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎ-পিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ, আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি, তবে কেন করিব না?" সহানুভূতিতে গোবিন্দ-লালের হৃদয় গলিয়া গেল। রোহিণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া সে তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। "চম্পকনির্ম্মিত মূর্ত্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে" তাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া রোহিণী চমকিয়া উঠিল, কিছুই বলিতে পারিল না। ইতিমধ্যে গোবিন্দলাল দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় মনোনিবেশ করিল—"সব সুন্দর, কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর! সৃষ্টি করুণাময়ী, মনুষ্য অকরুণ।" সে পুনরায় রোহিণীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন কামদেবের ক্রীড়া রোহিণীর উপরে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তাই সে আব্দার করিয়া বলিল—"একদিন বলিব, আজ নহে। একদিন

তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।” গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। পরে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া রোহিণী গোবিন্দলালের নিকটে তাহার দাবী উপস্থিত করিয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এইবারও রোহিণীর দ্বিতীয় আক্রমণ দার্শনিক গোবিন্দলালের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

“সেই অবধি নিত্য কলসী-কক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়, নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য গোবিন্দলালকে পুষ্পকানন মধ্যে দেখিতে পায়। এইরূপে গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত হইতে লাগিল। অবশেষে সে গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল।” পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনায় তাহার হৃদয়ে যে চিত্র অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, এখন তাহা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রোহিণীর মনেই প্রথম অভিলাষের উদয় হইয়াছিল। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—“কেন যে এতকাল

পর তাহার এ দুর্দ্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে— কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি। সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার উপর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ, এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না, যেমন ঘটিয়াছে, আমি তেমনই লিখিতেছি।” রোহিণীর মনে সুপ্তসিংহ জাগ্রত হইবার ফলে যে এইরূপ ঘটিয়াছিল, গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে ঘটনার বিশ্লেষণ করিয়া তাহারই নির্দ্দেশ দিয়া গেলেন। এই সময়ে রোহিণীর মনে যে সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহাও গ্রন্থকার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার মূলে ছিল

একটা প্রাচীন সংস্কার—রোহিণী যে বিধবা তাহা সে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। অতএব নিজের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া—"রোহিণী মনে মনে রাত্রিদিন মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল।" অনেকে হয়ত এই নজীরের উল্লেখ করিয়া রোহিণীর পক্ষে ওকালতী করিতে পারেন, কিন্তু তাহা বৃথা। কারণ যে বিষ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা নিরাকৃত করিতে চেষ্টা না করিয়া সে ইতিপূর্ব্বেই তাহার প্রভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, সুতরাং এই মৃত্যু-কামনার অন্তরালে আন্তরিকতা থাকিলে সে কখনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই অবস্থায় গোবিন্দলালকে গ্রাস করিতে ধাবিত হইত না। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, সে অতিমাত্র ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। "যদি গোবিন্দলাল ঘুণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয়ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। অতএব অতি যত্নে রোহিণী মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।" রোহিণীর এই সাক্ষ্য গোবিন্দলালের চরিত্র-বিশ্লেষণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় তত্ত্বের সন্ধান দিতেছে। কিন্তু

সর্ব্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবার মত অবস্থাও রোহিণীর নহে। অবশেষে সে স্থির করিল যে, গোবিন্দলালের মঙ্গলের জন্য প্রকৃত উইল যথাস্থানে রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে জাল উইল লইয়া আসিবে। এই কার্য্যে যাইয়া সে ধরা পড়িল, এবং গোবিন্দলালের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, সে তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা গ্রন্থকার এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

গো—কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে? আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই। রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহুকষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া বলিল—"না, অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে আর কখনও পাই নাই—যাহা আমি ইহজন্মে আর কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাহাই দিয়াছিলেন।"

গো—কি সে রোহিণী?

রো—সেই বারুণী পুকুরের তীরে মনে করুন।

গো—কি রোহিণী?

রো—কি? ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব

না কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম, কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নহে।

এইরূপে রোহিণী রমণী হইয়াও পুরুষের নিকট প্রেম-নিবেদন করিয়াছে। সামান্যা নায়িকাগণ এইরূপই লজ্জাহীনা হইয়া থাকে। ইহাই গোবিন্দলালের প্রতি তাহার তৃতীয় আক্রমণ।

রোহিণীর কথা শুনিয়া "গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাহার আহ্লাদ হইল না—রাগও হইল না—সমুদ্রবৎ যে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।" অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রোহিণীর তৃতীয় এবং এইরূপ কঠোর আক্রমণও ব্যর্থ হইয়া গেল।

রোহিণীর এই আত্মপ্রকাশের পর হইতে তাহার জীবন-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ

হইয়াছে। কাজটা যে ভাল হয় নাই, তাহা গোবিন্দলালের মুখে শুনিয়া বালিকা ভ্রমরের সিদ্ধান্ত করিতেও এক মুহূর্ত্ত দেরী হয় নাই, কারণ একের এইরূপ স্বীকারোক্তি অন্যের মনেও অভিলাষের উদ্রেক করিতে পারে। কিন্তু রোহিণী ছিল চতুরা। তাহার মনে ভয় ছিল, তাহার মনের কথা জানিতে পারিলে গোবিন্দলাল হয়ত তাহাকে দেশের বাহির করিয়া দিবে। এই সুযোগে সে ইহার পরীক্ষা করিয়া লইল। দেখিল যে, তাহার কথা শুনিয়া গোবিন্দলাল তর্জ্জন গর্জ্জন করিল না, কিন্তু শান্তভাবে তাহাকে দেশত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিল মাত্র। অতএব সে মনে করিল, যাহা সে অপ্রাপ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় দুষ্প্রাপ্য হইবে না। এইরূপে তাহার প্রাথমিক ভীতি দূরীভূত হইয়া গেল।

গোবিন্দলাল ছিল অতিশয় আত্মবিশ্বাসী, এবং তাহার মহানুভবতাও ছিল অসীম। রোহিণীর প্রেম-নিবেদন শুনিয়া "তাহার আহ্লাদ হইল না—রাগও হইল না—সমুদ্রবৎ যে হৃদয় তাহা

উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।[১] বলিলেন, —"রোহিণি, মৃত্যুই, বোধ হয়, তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি—আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?" গোবিন্দলালের এই মহত্ত্বের মর্ম্ম রোহিণী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সাধারণী নায়িকাগণ সাধারণতঃ অতিশয় প্রগলভা ও লজ্জাহীনা হইয়া থাকে। গোবিন্দলালের এই সদয় ব্যবহারে যে রোহিণীর স্পর্দ্ধা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা তাহার পরবর্ত্তী ব্যবহারে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে সে দেশ

১। কোন সমালোচক লিখিয়াছেন,—"শুধু আহ্লাদ হইল না, ইহা শুনিলেই আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত ও আহ্লাদিত হই। যখন তাহার সঙ্গে পড়ি, রাগও হইল না, তখন তাহার মাধুর্য্যে আমরা মোহিত হইয়া পড়ি। যে শ্রেণীস্থ লোকের ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদ হয় না, উহাদের প্রায়ই রাগ হয়। দুশ্চরিত্রার ঘৃণিত অভিলাষের কথা শুনিয়া ঘৃণা হয়।** কিন্তু অবিচলিত চিত্তে এরূপ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা, শুনিতেই আশ্চর্য্য বোধ হয়।" (গিরিজা রায় চৌধুরী মহাশয়ের "বঙ্কিমচন্দ্র" ৬ পৃঃ)।

ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু পরে এক সুযোগে আসিয়া গোবিন্দলালকে বলিয়া গেল যে, সে যাইবে না। এইরূপে চতুর্থবার গোবিন্দলালকে আঘাত করিয়া রোহিণী তাহার হৃদয় উদ্বেলিত করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, কারণ ইহার পরেই সে ভ্রমরের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছিল।

রোহিণীর এই সাহসিকতার জন্য গোবিন্দলালের দায়িত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দয়া ধর্ম্ম বটে, কিন্তু দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া ইহা প্রদর্শন করা উচিত, নতুবা যাহাকে দয়া করা হয় তাহারও অনিষ্ট সাধিত হয়, আর যিনি দয়া করেন তিনিও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। রোহিণী গোবিন্দলালকে পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিতে আসিতেছে, ইহা প্রতিরোধ করিবার জন্য দার্শনিক গোবিন্দলাল সামান্য কঠোরতাও অবলম্বন করা সঙ্গত মনে করে নাই। যে তাহাকে সর্ব্বসম্পদ্ হইতে বিচ্যুত করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছিল, তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া গোবিন্দলাল অদূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। রোহিণী তাহার

পাপাসক্তির জন্য নিজের মৃত্যু কামনা করিয়াছে, গোবিন্দলালের প্রতি তাহার আসক্তির কথা জানিতে পারিয়া বালিকা ভ্রমরও তাহার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা দিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, অথচ গোবিন্দলাল বলিল—"মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি—আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?" বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া এই নীতি অবলম্বনে কার্য্য করিলে ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়, এবং তাহার ফলে সংসারে আসে অরাজকতা, আর ইহার পরিণতি হয় অতীব ভীষণ। গোবিন্দলালকেও তাহার প্রাথমিক দুর্ব্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল রোহিণীকে হত্যা করিয়া। যে বিষবৃক্ষ তাহারই অবহেলায় বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারই চরম পরিণতিতে রোহিণী মরিল, ভ্রমর মরিল এবং গোবিন্দলালের সুখ শান্তি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গেল।

হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, গোবিন্দলালের হৃদয়ে রূপতৃষ্ণা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল,

আর তাহারই ফলে রোহিণীর প্রতি আকর্ষণ হেতু তাহার এই দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোনই কারণ নাই। রূপে পরিতৃপ্ত হওয়া মানুষ-মাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক, যাহারা হয় না, তাহারা হয় দস্যু বা দানব, নতুবা মৃত। অতএব গোবিন্দলালের হৃদয়ে রূপতৃষ্ণা ছিল কি না, ইহা আলোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে না, কিন্তু রোহিণীর রূপে সে আকৃষ্ট হইয়াছিল কি না, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। রোহিণীকে সে বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কখনও তাহার রূপে মোহিত হয় নাই। তার পর রোহিণীর যৌবনও তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, এবং তাহার বৈধব্য-অবস্থার সুযোগও গ্রহণ করিতে সে চেষ্টিত হয় নাই। গ্রন্থের প্রথম ভাগে রোহিণীর সহিত ব্যবহারে তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণেরও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। যদি রোহিণীর প্রতি সে অণুমাত্রও আকৃষ্ট হইত তাহা হইলে তাহার মনে আসিত লজ্জা এবং সঙ্কোচ। রোহিণীর প্রতি ব্যবহারে ইহা নিশ্চয়ই

2—O. P. 64

প্রকাশিত হইয়া পড়িত। অপর দিক্ দিয়া বিচার করিলেও ইহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায়। গোবিন্দলাল ছিল বিবাহিত এবং ভ্রমর ছিল তাহার আদরের পত্নী। রোহিণীর প্রতি তাহার মনে অবৈধ প্রণয় জন্মিলে, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িত ভ্রমরের প্রতি ব্যবহারে। কিন্তু রোহিণীর প্রেম-নিবেদনের কথা সে অকপটে ভ্রমরের নিকট ব্যক্ত করিয়া দিয়াছিল। মনে কোন প্রকার কালিমা থাকিলে, সে কখনও ভ্রমরের নিকট ইহা প্রকাশ করিতে পারিত না। ইহার পর যখন সে সত্য সত্যই রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তখন রোহিণীকে জল হইতে উদ্ধার করা-কালীন রাত্রির ঘটনা সে ভ্রমরের নিকট গোপন রাখিয়াছিল। ভ্রমর নানাভাবে অনুরোধ করিয়াও অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে থাকিবার কারণ জানিতে পারে নাই। আর গোবিন্দলালও নিজের চিত্ত-শুদ্ধির জন্য বন্দরখালিতে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার এই পলায়ন এবং সঙ্কোচ-অবস্থাই তাহার মনের আবহাওয়ার সন্ধান বলিয়া দিতেছে। ইহার পূর্ব্বে ভ্রমর এবং রোহিণীর

প্রতি ব্যবহারে ইহা পরিলক্ষিত হয় না। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে না যে, রোহিণীর প্রতি আকর্ষণ হেতু সে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিল। এই সময়ে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে স্পষ্টই বলিয়াছিল—"আমি রোহিণীকে ভালবাসি না, রোহিণী আমায় ভালবাসে।"

ইহারই ফলে ভ্রমর রোহিণীকে বারুণী-পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিবার নির্দ্দেশ দিয়া পাঠাইল, আর রোহিণীও বালিকা ভ্রমরের কথায় আত্মহত্যায় স্বীকৃত হইয়া গেল। ইহা আপাততঃ রহস্যময় বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনই কারণ নাই। মানুষ অন্যায় কার্য্য যথাসাধ্য গোপনে সম্পাদিত করিতে চেষ্টা করে, কারণ লজ্জা, ভীতি ও অপমান তখনই অধিকতর তীব্রভাবে অনুভূত হয়, যখন ইহা সাধারণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। রোহিণী মনে মনে বহুবার মৃত্যু কামনা করিয়াও মরে নাই, কিন্তু যখন ভ্রমরের নিকট হইতে মৃত্যুর আদেশ আসিয়া পড়িল, তখন সে বুঝিতে পারিল যে, ভ্রমর তাহার

গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত তাহার মনের কথা গোবিন্দলাল ব্যতীত অন্যে জানিতে পারে নাই বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল, ততদিন সে নিজেকে তত হেয় জ্ঞান করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে জানিয়া আত্মনির্য্যাতনের প্রবৃত্তি তাহার মনে জাগরিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দ্বিতীয়তঃ এই ঘটনায় সে ইহাও বুঝিতে পারিল যে, গোবিন্দলাল নিশ্চয়ই ভ্রমরকে তাহার প্রেম-নিবেদনের কথা বলিয়াছে, নতুবা যাহা একমাত্র গোবিন্দলাল ভিন্ন আর কেহই জানে না, তাহা ভ্রমরের পক্ষে জানা সম্ভবপর ছিল না। এই ঘটনায় বুদ্ধিমতী রোহিণীর পক্ষে ইহা বুঝা কষ্টকর হইল না যে, তাহার প্রতি গোবিন্দলালের সামান্য আকর্ষণ থাকিলেও সে এই কথা ভ্রমরের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিত না। এত চেষ্টা করিয়াও সে গোবিন্দলালকে বিচলিত করিতে পারে নাই, এই ধারণা যে তাহার হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক যাতনার সৃষ্টি করিবে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। হরলালের নিকট প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সে

গোবিন্দলালকে অবলম্বন করিয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিল যে, গোবিন্দলালও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। উপর্য্যুপরি এইরূপ দুইটি আঘাত সহ্য করা তাহার ন্যায় অনাধুনিকা গ্রাম্য রমণীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় নিরাশার মেঘে তাহার হৃদয়-গগন আচ্ছাদিত হওয়াতে সে মৃত্যুকেই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া সহজেই বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলাল যখন প্রসাদপুরে রোহিণীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন সে মরিতে চাহে নাই। ইহার কারণ এই যে, তখন রোহিণী অনেক দেখিয়াছে ও অনেক শিখিয়াছে। সে বুঝিয়াছিল যে, হরলাল ও গোবিন্দলাল ব্যতীতও পৃথিবীতে আশ্রয়বৃক্ষের অভাব হইবে না। অতএব তাহার আশা ছিল—সে জীবন উপভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু এখন নিরাশার অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তথাপি বলা যাইতে পারে যে, ইহাই রোহিণী-চরিত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি। গোবিন্দলাল এই ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া

পড়িয়াছিল, কারণ সে ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল যে, বৈধব্যের যন্ত্রণায় এই অসহায়া রমণী আত্মহত্যায় ব্রতী হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ইহাতে পূর্ণ সহানুভূতিরও উদয় হয় না, কারণ আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, অসৎ প্রবৃত্তির বশে পরের অনিষ্ট সাধনে অসমর্থ হইয়া সে এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

ইহার পরে রোহিণী আসিয়া বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিল, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহার প্রাণ রক্ষা করিল। এই ঘটনাতেই আখ্যায়িকার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সেই সন্ধিক্ষণের বিবরণ এইভাবে গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—“সেইখানে আজি গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া দর্পনানুরূপ বারুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, সেই পুষ্করিণীর সুপরিসর প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান পরম্পরায় রোহিণী কলসী-কক্ষে অবরোহণ করিতেছে। রোহিণীর জলে নামিয়া গাত্র-মার্জ্জনা করিবার সম্ভাবনা—দৃষ্টিপথে তাঁহার থাকা অকর্ত্তব্য

বলিয়া গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।”

রোহিণীর প্রতি আকর্ষণ থাকিলে গোবিন্দলাল এই সুযোগে তাহার রূপ-মদিরা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিত। কলুষিত হৃদয়ে সুরুচি ও নীতিজ্ঞান প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু গোবিন্দলাল অণুমাত্রও দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিল না। অতএব ঝটিকার প্রাক্কালে আমরা জলধিবক্ষ স্থির, শান্ত, অবিচলিতই দেখিতে পাইতেছি। তারপর অনেকক্ষণ গোবিন্দলাল এদিক্ ওদিক্ বেড়াইল। শেষে মনে করিল, এতক্ষণ রোহিণী উঠিয়া গিয়াছে। তখন পুনরায় বারুণী-তীরে আসিয়া দেখিল যে, জলের উপরে একটি কলসী ভাসিতেছে। হঠাৎ তাহার সন্দেহ হইল—কেহ জল লইতে আসিয়া ডুবিয়া যায় নাই ত? তখন অকস্মাৎ পূর্ব্বাহ্নের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, ভ্রমর রোহিণীকে বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে বলিয়াছিল, আর রোহিণীও তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ গোবিন্দলাল পুষ্করিণীর

ঘাটে আসিয়া দেখিল, রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। সে তাহাকে উঠাইয়া মালীর সাহায্যে উত্থানস্থ প্রমোদ-গৃহে লইয়া গেল। তারপর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্জ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশাল-দীর্ঘ-বিলম্বিত ঘোর কৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘ যেন জলবৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত ; কিন্তু সেই মুদ্রিত পদ্মের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে, আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট—গণ্ড এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলী-পুষ্পের লজ্জাস্থল।" সুরুচিসম্পন্ন গ্রন্থকারের লেখনী এখানেই থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি যে, গোবিন্দলাল আরও অনেক দেখিয়াছিল, এবং দেখিয়া রোহিণী যে রূপবতী এই ধারণা গভীরভাবে তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—"মরি মরি ! কেন তোমায় বিধাতা এত

রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন?" এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল—একথা মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। অর্থাৎ রূপের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই সমবেদনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। ইহাই আকর্ষণের পূর্ব্বাভাস। গ্রন্থকার একস্থানে লিখিয়াছেন—"অনেকদিন হইতে রূপতৃষ্ণা গোবিন্দলালের হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছিল।" মানুষের অবচেতন মনের সন্ধান মিলে তাহার অভিব্যক্তিতে। আমাদের আকৃতি-গত ও চরিত্রগত যাবতীয় বিশেষত্ব অতীতের আত্মপ্রকাশ মাত্র। ইহাই সংস্কার ও দুর্জ্জেয় দৈবরূপে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এবং তাহারই ফলে আমাদের হৃদয়ে অবিরত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। নিবৃত্তি বলবতী হইলে প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু প্রবৃত্তি বলবতী হইলেই আমরা অবচেতন মনের সন্ধান পাইয়া থাকি। ইহার স্পষ্ট অভিব্যক্তি রহিয়াছে রোহিণীর ব্যবহারে, কারণ হরলালের প্রস্তাব শুনিয়াই সে সম্মতি প্রদান

করিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীর পুনঃপুনঃ আহ্বানেও গোবিন্দলাল দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করে নাই। কাল ভ্রমরের পতি যুবক গোবিন্দলালের হৃদয়ে বাসনার মূল নিহিত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বিত্তশালী গোবিন্দলালের পক্ষে নানা উপায়ে ইহা চরিতার্থ করিবার সুযোগ থাকিলেও, সে এ পর্য্যন্ত কোনও প্রকার অবিবেচনার কার্য্য করিয়া বসে নাই। রোহিণীকেত সে বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছিল। তাহার রূপ ছিল বটে, কিন্তু তাহা অবলম্বন করিয়া ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার কল্পনা কখনও তাহার মনে উদিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত আখ্যায়িকা যতদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহাতেও গোবিন্দলালের রূপ-পিপাসিত হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না। তথাপি রূপতৃষ্ণা যদি তাহার হৃদয়ে অজ্ঞাতভাবে অবস্থান করিয়াই থাকে, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রোহিণীকে অবলম্বন করিয়া ইহাই তাহার প্রথম আত্মপ্রকাশ। রোহিণী নিজের রূপ-প্রভায় উচ্ছৃঙ্খল হরলালকেও মোহিত করিতে পারে

নাই, কিন্তু গ্রন্থকার তাহাকেই সুকৌশলে ভ্রমর-প্রেম-পরিতৃপ্ত গোবিন্দলালের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। এখানে কুমারসম্ভবের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। মহাদেবের নেত্রবহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হইয়াছিল, এখন গোবিন্দলালও সেই অনঙ্গের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া বসিল।

গোবিন্দলাল ছিল অতিশয় সংযমী। সঞ্জীবিত হইয়া তাহার আত্মহত্যার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া রোহিণী বলিয়াছিল—"রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিবনা। আশাও নাই।" লজ্জাহীনা সাধারণী নায়িকার এই আত্মসমর্পণেও গোবিন্দলাল দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করে নাই। তৃষ্ণা নিবারণের শীতল জল সম্মুখে ধরিয়া পান করিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করা হইতেছিল। এই সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া সে অসাধারণ হৃদয়বলের পরিচয় প্রদান করিল। একটা কথা আছে যে, মানুষ চলে উল্টা কলে

অর্থাৎ প্রকৃত মানুষের জীবন-নদীতে জল স্রোতের উজানে প্রবাহিত হয়। সাধারণ মানুষ যে স্রোতে গা ভাসাইয়া দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিতে দ্বিধাবোধ করিত না, গোবিন্দলাল তাহারই বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিল। ইহাই আদর্শ চরিত্রের বিশেষত্ব। এখানে সংযমে গোবিন্দলাল বিশ্বামিত্রকেও পরাজিত করিয়াছে।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"রোহিণীকে বিদায় করিয়া গোবিন্দলাল সেই বিজন কক্ষ মধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটীতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত-লোচনে ডাকিতে লাগিলেন—হাঁ নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর! তুমি বল না দিলে কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।" অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রোহিণীর পঞ্চম আক্রমণে গোবিন্দলাল বিচলিত হইয়া পড়িলেও চিত্তজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

তাহার এই সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া আমরা গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব্বে প্রবেশ করিতেছি।

রোহিণীর রূপে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট রাত্রির ঘটনা গোপন করিয়া গিয়াছিল। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ইহা গোবিন্দলালের পক্ষে অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়, গোপন করিয়া সে সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়াছিল। ভ্রমরের সহিত তাহার স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ, আর ইহাও সে জানিত যে, তাঁহার উপর ভ্রমরের অগাধ বিশ্বাস ছিল। এই অবস্থায় রোহিণীর প্রতি আসক্তির কথা ভ্রমরের নিকট ব্যক্ত করিলে তাহাতে এক দিকে যেমন সে বিশ্বাস-ঘাতক প্রতিপন্ন হইত, অপরদিকে ভ্রমরের মনে যে আঘাত আসিয়া পৌঁছিত, তাহাতে তাহাদের সুখশান্তি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যাইতে পারিত। অনুরূপ ঘটনায় নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর নিকট বলিয়াছিলেন—"আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা" ইত্যাদি। কিন্তু তাহাতে যে অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা 'বিষবৃক্ষে'

বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত রহিয়াছে। ঐরূপ পরিণতি যাহাতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যে ভ্রমরের নিকট রাত্রির ঘটনা গোপন করা গোবিন্দলালের পক্ষে অবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। ইহাতে ভ্রমরের হৃদয়ে অশান্তি-অনল প্রজ্জ্বলিত করিবার অনিচ্ছাই স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দলালের এই সময়কার প্রকৃত মনোভাবও ভ্রমরের সহিত কথোপকথনে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া যখন "ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তখন গোবিন্দলাল ভ্রমরের চক্ষের জল মুছাইয়া, আদর করিয়া বলিলেন—আর একদিন বলিব, ভ্রমর—আজ নহে।

ভ্রমর—আজ নহে কেন?

গোবিন্দ—তুমি এখন বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।

ভ্রমর—কাল আমি বুড়া হইব?

গোবিন্দ—কালও বলিব না—দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না, ভ্রমর।"

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রোহিণীর প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইলেও ভ্রমরকে সুখী করিবার ব্যগ্রতা গোবিন্দলালের সমভাবেই রহিয়া গিয়াছে, এবং ভ্রমরের মনে অশান্তির সৃষ্টি করিবার অনিচ্ছাতেই সে বলিয়াছিল—"সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।" যে পঙ্কে সে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তাহার সংস্পর্শ হইতে প্রাণাধিক ভ্রমরকে দূরে রাখাই গোবিন্দলালের উদ্দেশ্য। কিন্তু "দুই বৎসর পরে বলিব" ইহা বলিবার কারণ কি? ইহাকেত বৃথা স্তোকবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। গোবিন্দলাল ছিল প্রকৃত যোদ্ধা, এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর অতিশয় নির্ভরশীল। মন বিচলিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াই সে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিল। প্রথমতঃ ভ্রমরকে ইহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিব না, দ্বিতীয়তঃ চিত্ত জয় করিব, কামনার বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হইবে। এই কার্য্যে দুই বৎসর অতিবাহিত হইতে পারে, ইহাই ছিল তাহার ধারণা। আর এই জন্যই সে ভ্রমেরের নিকট

দুই বৎসরের কথা বলিয়াছিল।[১] কিন্তু শুধু সঙ্কল্প করিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই, চিত্তশুদ্ধির জন্য বন্দরখালিতে চলিয়া গিয়াছিল। সংসারের সুখশান্তি এবং ভ্রমরের সেবা হইতে এইরূপে সে স্বেচ্ছায় নিজকে নির্ব্বাসিত করিল! রোহিণীর প্রভাবের বহির্ভূত হওয়াও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। রোহিণী যদি তাহার ভ্রমরাধিক প্রিয় হইত তাহা হইলে হরিদ্রাগ্রামে থাকিয়াই সে এই বিষামৃত পান করিতে পারিত, দূরে যাইবার প্রয়োজন হইত না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গোবিন্দলাল অন্তরে অন্তরে ভ্রমরকেই চাহিতেছিল, রোহিণীকে নহে। যে উপগ্রহ আসিয়া তাহাকে কক্ষচ্যুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহার প্রভাব হইতে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করিবার জন্য তাহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিতে আজ সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

১। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ও লিখিয়াছেন —"বুঝিয়াছি, রোহিণীর প্রতি তোমার এ পাপবাসনা যে পর্য্যন্ত বিদূরিত করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত ভ্রমরকে তাহা জানাইতে ইচ্ছা করিতেছ না।" (বঙ্কিমচন্দ্র, ১১ পৃঃ)।

তাহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, আমরা তাহাকে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শতবানি সোনার ন্যায় অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি-বিভূষিত দেখিতে পাইতাম। কিন্তু তাহার হরিদ্রাগ্রামে অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া সয়তান আসিয়া তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল।

আত্মহত্যার ঘটনার দিন অধিক রাত্রিতে রোহিণী গোবিন্দলালের বাগান হইতে ঘরে ফিরিয়াছিল। ইহা পাঁচী চাঁড়ালনী দেখিয়া প্রকাশ করিয়া দেয়। তারপর চাকরাণীদের দ্বারা নানাপ্রকারে পল্লবিত হইয়া ইহা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে। "কথা যদি রটিল, রোহিণীর কাণেই বা না উঠিবে কেন? রোহিণী শুনিল, গ্রামে রাষ্ট্র যে, গোবিন্দলাল তাহার গোলাম, —সাতহাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। কথা যে কোথা হইতে রটিল, তাহা রোহিণী শুনে নাই —কে রটাইল তাহার তদন্ত করে নাই, একেবারে সিদ্ধান্ত করিল যে, তবে ভ্রমরই রটাইয়াছে, নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার?" এইরূপ ধারণা করিবার সঙ্গত কারণও ছিল। রোহিণী জানিত যে, তাহার

গুপ্ত প্রণয়ের কথা গোবিন্দলাল ব্যতীত একমাত্র ভ্রমরই জানে, কারণ সে তাহাকে মরিবার ব্যবস্থা দিয়াছিল। গোবিন্দলাল নিজের কুৎসা নিজে রটনা করিতে পারে না, অতএব ভ্রমরই যে, বিদ্বেষ-বশে ইহা রটাইয়াছে, এইরূপ ধারণায় উপনীত হওয়া রোহিণীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সে মোকদ্দমা ডিগ্রী দিয়া বসিল একতর্ফা। সত্যাসত্য নির্ণয়ের কোন চেষ্টা না করিয়া সে একেবারে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল যে, ভ্রমরই ইহা রটাইয়াছে, এবং ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ধার করা গহনা দেখাইয়া ভ্রমরের নিকট প্রচার করিল যে, ঐ সকল অলঙ্কার সে গোবিন্দ-লালের নিকট পাইয়াছে। ভ্রমর অসহায় ; একে ত সেই রাত্রির ঘটনায় গোবিন্দলালের প্রতি তাহার সন্দেহ জাগরিত হইয়াছিল, তাহার উপর ক্ষীরি চাকরাণী এবং গ্রামের মেয়েরা আসিয়া জানাইয়া গিয়াছিল—“ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।” অবশেষে রোহিণী আসিয়া যখন নিজের মুখে আত্মদোষ স্বীকার করিয়া গেল, তখন ভ্রমর একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। স্ত্রীলোক

যতই দুশ্চরিত্রা হউক না কেন, নিজের মিথ্যা কলঙ্ক নিজে এইভাবে রটনা করিতে পারে, ইহা ভ্রমরের ধারণার অতীত। অতএব ভ্রমর গোবিন্দ-লালকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ফেলিল। কিন্তু এখানেও মোকদ্দমা এক তরফা ডিগ্রী হইয়া গেল। গোবিন্দলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কিন্তু গোবিন্দলাল উপস্থিত নাই। যাহারা সাক্ষ্য দিল তাহারা সকলেই শুনা কথা আবৃত্তি করিয়া গেল। রোহিণীও নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। ভ্রমরের পক্ষে এই জটিলতার সমাধান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব গোবিন্দলালের নিকট পত্র লিখিয়া সে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

এখন গোবিন্দলালের পালা। সে বাড়ী আসিয়া দেখিল ভ্রমর অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে। দেখিয়া তাহারও "মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন—এত অবিশ্বাস? না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল? আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে

কি প্রাণ ধারণ করিতে পারে না ?” অতএব অভিমানবশতঃ সে নিজের সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। যে রোহিণীকে ভুলিবার জন্য সে বন্দরখালিতে চলিয়া গিয়াছিল, এখন ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য তাহাকেই অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল ! রোহিণী পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও গোবিন্দলালকে অবনমিত করিতে পারে নাই, এখন স্বেচ্ছায় আসিয়া গোবিন্দলাল তাহাকে ধরা দিতে প্রস্তুত হইল। গোবিন্দলালের এই পতন লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন— “আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।” গোবিন্দলাল নিজেও কাঁদিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।

কিন্তু অভিমান ও অবিবেচনার পালা এইখানেই শেষ হয় নাই। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে আমরা সুবিবেচক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। বস্তুতঃ গ্রন্থকার তাঁহাকে ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানবৃদ্ধরূপেই অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু লোকের মুখে গোবিন্দ-লালের অধঃপতনের কথা শুনিয়া তিনি গোবিন্দ-

লালকে একবার জিজ্ঞাসা করিবারও সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথচ মৃত্যুর পূর্ব্বে গোবিন্দলালের সম্পত্তি ভ্রমরের নামে লিখিয়া দিয়া গেলেন। তখন স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে ভীষণ মান-অভিমানের যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহা বুঝিবার সুযোগ পাইয়াও তিনি উইল পরিবর্ত্তিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহা গোবিন্দলালের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়ই বলিতে হইবে। তারপর গোবিন্দলালের মাতাঠাকুরাণী। ভ্রমরের নামে বিষয় হইল দেখিয়া তিনিও অভিমান করিয়া কাশীতে চলিয়া গেলেন। এইরূপে একে একে সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া গোবিন্দলালের সংশোধনের আর কোন উপায়ই রহিল না। কাশী যাইবার ছলে সে ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, এবং পরে রোহিণীর সহিত মিলিত হইয়া প্রসাদপুরে বাস করিতে লাগিল। এইরূপে প্রকাণ্ড শালবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া সকলে মিলিয়া রোহিণীর উপরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহাতে যে বিষাদময় নাটকের সূচনা হইয়া গেল, তাহার এই অঙ্কে প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির অভিনয়ে কাহার কিরূপ

বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গোবিন্দ-লালের হৃদয়ে দারুণ অভিমানের উদয় হইয়াছিল। ভালবাসার আতিশয্যে দুর্জ্জয় অভিমানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভ্রমর প্রাণ ভরিয়া গোবিন্দলালকে ভালবাসিত, তাই অভিমানে পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল। গোবিন্দলালের হৃদয়েও যে অভিমানের উদয় হইল তাহা ভ্রমরের অভিমানের প্রতিক্রিয়া মাত্র। এখানে গোবিন্দলাল ভ্রমরের পথই অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু অভিমান করিয়া তাহার যে অবস্থা হইল, তাহা গ্রন্থকার এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন— "গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরের বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব। মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। কিন্তু এক একবার শূন্য গৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। আবার চোখের জল মুছিয়া রাগ করিলেন।" হায় ভ্রমর! এই সময়ে তুমি কাছে থাকিলে তোমার সুখের সংসার

ধ্বংস হইয়া যাইত না। যে তোমার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেছে তুমি তাহাকেই কাঁদাইয়াছ! আমরা এখনও দেখিতে পাইতেছি যে, গোবিন্দলাল ভ্রমরেরই, রোহিণীর নহে। তৎপর "গোবিন্দলাল মনে করিলেন ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায় রোহিণীর চিন্তা। গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপনি আপন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।" মানুষ আত্মহত্যাও করিয়া থাকে, গোবিন্দলাল এখন অনুরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। নরহত্যাকারী পাগলের ফাঁসি হয় না, কারণ সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। গোবিন্দলালও এখন সেইরূপ অবস্থায় উপনীত, অতএব তাহার এই উন্মাদ অবস্থার কার্য্য-কলাপের জন্য তাহাকে দায়ী করিতে পারা যায় না, কারণ আমরা প্রকৃতিস্থ লোকেরই দোষগুণ বিচার করিয়া থাকি। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, অদমনীয় রূপতৃষ্ণা প্রশমিত করিবার জন্য গোবিন্দলাল রোহিণীকে অবলম্বন করিয়াছিল। এই উক্তি বিচারসহ নহে। গোবিন্দলালের পতনের কেবল একটি মুখ্য কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—তাহার দুর্জ্জয়

অভিমান। হৃদয়বলে যে সে হীন নহে, তাহা রোহিণীর সহিত ব্যবহারে ইতিপূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এখন এই সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়াও আমরা দেখিতেছি যে, রূপের মোহ এই সময়ে তাহার হৃদয়ে ততটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, যতটা করিয়াছে তাহার বিজাতীয় অভিমান। এখানে অভিমানই মুখ্য, রূপতৃষ্ণা গৌণ। গোবিন্দলালের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষের পক্ষে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা জয় করা কষ্টকর হইত না। সে এইজন্য সুচিন্তিত পন্থাও অবলম্বন করিয়াছিল, এবং বিবিধ প্রতিকূল ঘটনার আবর্ত্তে না পড়িলে সে যে ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিত, তাহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু যে অভিমানের উত্তেজনায় তাহার হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল, তাহা প্রশমিত করিবার কোনই উপায় ছিল না। অভিমান হয় প্রিয়জনের উপর, এবং তাহা প্রশমিত হয় প্রিয়জনের সাহচর্য্যে। ভ্রমরের অভিমানেই গোবিন্দলালের অভিমান, অতএব এই সময়ে ভ্রমর নিকটে থাকিলে ইহার একটা সুমীমাংসা হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু ভ্রমরের দূরত্ব পুনর্ম্মিলনের

অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। অধিকন্তু ইহা গোবিন্দলালের রোষাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া তাহা এতটাই প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল যে, গোবিন্দলাল তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। তাই সে ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য রোহিণীকে অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে রোহিণীকে ভুলিবার জন্যই স্বেচ্ছায় বন্দরখালিতে চলিয়া গিয়াছিল। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, অভিমানই গোবিন্দলালের পতনের মুখ্য কারণ, ভোগলিপ্সা নহে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আমরা যেমন মনে মনে শত সহস্র অপরাধ করিয়া থাকি, গোবিন্দলাল এখন পর্য্যন্ত তাহার অতিরিক্ত কিছুই করিয়া বসে নাই। রোহিণীকে সে অবলম্বন করিবে বলিয়া ভাবিতেছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ সেই দিকে তাহার অণুমাত্রও চেষ্টা লক্ষিত হয় না। বোধ হয় তাহার মনের বাসনা মনেই বিলীন হইয়া যাইত, যদি কালামুখী রোহিণী তাহার রূপ-মদিরা পান করাইবার জন্য পুনরায় গোবিন্দলালের সম্মুখে উপস্থিত না হইত। গ্রামময় তাহার

অপবাদ রটিয়া গিয়াছিল, ভদ্র রমণী হইলে সে জীবন্মৃত অবস্থায় অবস্থান করিত, এবং কখনও গোবিন্দলালের সম্মুখে বাহির হইত না। কিন্তু ইহা-সত্ত্বেও সে স্বেচ্ছায় আসিয়া গোবিন্দলালের নিকটে আত্ম-সমর্পণ করিল। বর্ষাকাল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাদল হইয়াছে, সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হয়, এমন সময়ে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণী হইতে জল লইতে আসিয়াছে। এখানে আমরা গ্রন্থকারের বর্ণনাই উদ্ধৃত করিতেছি। "প্রায়াগতা যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার, বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না। গোবিন্দলাল অস্পষ্টভাবে দেখিলেন যে, একজন স্ত্রীলোক নামিতেছে। পাছে পিছলে পা পিছ্‌লাইয়া স্ত্রীলোকটি জলে পড়িয়া গিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, ভাবিয়া গোবিন্দলাল কিছু ব্যস্ত হইলেন। পুষ্পমণ্ডপ হইতে ডাকিয়া বলিলেন—কে গা তুমি? আজ ঘাটে নামিও না, বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে।" স্বর শুনিয়া রোহিণী কলসী নামাইল, এবং উদ্যান মধ্যে গোবিন্দলালের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল বলিলেন —"ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন, রোহিণি?

রো—আপনি কি আমায় ডাকিলেন ?

গো—ডাকি নাই। ঘাটে বড় পিছল, নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন ?

রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমধ্যে উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন—লোকে দেখিলে কি বলিবে ?” পুরুষ গোবিন্দলালের হৃদয়ে যে লোকাপবাদের ভয় রহিয়াছে, রোহিণীর তাহাও নাই। সে বলিল—“যা বলিবার, তা বলিতেছে। সে কথা আপনার কাছে একদিন বলিব বলিয়া অনেক যত্ন করিতেছি।” হতভাগিনী বুঝিল, ইহাই তাহা বলিবার উপযুক্ত অবসর! রাত্রির অন্ধকারে, একা গোপনে, গোবিন্দলালের প্রমোদ-উদ্যানে সে গোবিন্দলালের সহিত ইহার মীমাংসা করিতে আসিয়াছে! গোবিন্দলাল ভয় করিতে-ছিল, লোকের চক্ষু আছে, কিন্তু রোহিণী মনে করিয়াছিল, বুঝি বিধাতাও অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। আবার অপবাদ রটিয়াছে লোকের মুখে মুখে, তখন গোবিন্দলাল বিদেশে, কিন্তু রোহিণী ভাবিল ইহার মীমাংসা গোবিন্দলালের সহিত এইভাবেই

করিতে হইবে ! ইচ্ছা করিয়া এরূপ বোকা সাজি-বার অভিনয় চতুরা রোহিণীর উপযুক্তই হইয়াছে। এই সময়ে সেখানে উভয়ের যে কথাবার্ত্তা হইল তাহা লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"তাহার পরিচয় দিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না", অর্থাৎ রোহিণী মিথ্যা অপবাদের প্রতীকার করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তাহা সত্যে পরিণত করিয়া গেল। এতদিন পরে রোহিণী বুঝিতে পারিল যে, গোবিন্দলাল তাহার রূপে মুগ্ধ, অর্থাৎ তাহার এই ষষ্ঠ আক্রমণে অবশেষে সে গোবিন্দলালকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বসিল ! এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, গোবিন্দলাল রোহিণীকে পথভ্রষ্ট করে নাই, রোহিণীই গোবিন্দ-লালকে কক্ষচ্যুত করিয়াছে।

ইহার পরেই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"গোবিন্দ লালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল", অর্থাৎ রোহিণী তাহার নিকট অতি সহজলভ্যা হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল স্ত্রীলোক এইরূপ অবৈধ প্রণয়ে আত্ম-বিক্রয় করিতে দ্বিধা বোধ করে না, মনুষ্যসমাজে তাহারা সর্ব্বনিম্নস্তরের রমণী বলিয়া অবহেলিত

হইয়া আসিতেছে। হরলালের সঙ্গে তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দলালের সঙ্গে সেইরূপ কিছুই হয় নাই। বিষবৃক্ষে বিধবা কুন্দনন্দিনীকেও নগেন্দ্র যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। আর গোবিন্দলাল রোহিণীকে সামান্যা ভোগ্যা রমণীরূপে গ্রহণ করিল। এখানেই রোহিণী নিজেকে নিজে হত্যা করিয়া বসিল। তাহার দ্বিতীয় হত্যায় গোবিন্দলাল উপলক্ষ মাত্র।

যাহাই হউক, ইহাদের পিরীতির প্রথম অভিনয়টা হরিদ্রাগ্রামেই সম্পন্ন হইয়াছিল। তৎপর কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের অংশ ভ্রমরের নামে লিখিয়া দিয়া পরলোকে গমন করিলেন। ইহার ফলে গোবিন্দলাল বিত্তহীন, এবং ভ্রমরের করুণাভিখারী হইয়া পড়িল। এই অবিচার গোবিন্দলাল সহ্য করিতে পারিল না। অতএব তাহাকে হরিদ্রাগ্রামের বাস উঠাইতে হইল। রোহিণীকে লইয়া সে প্রসাদপুরে যাইয়া বাস করিতে লাগিল।

হরিদ্রাগ্রামে রোহিণী গোবিন্দলালের উপ-পত্নীর আসন গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রসাদপুরে

আসিয়া তাহার অবস্থার উন্নতি হইল। এখানে সে গৃহিণীর পর্য্যায়েই অধিষ্ঠিত হইয়া একটা সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। বিবাহিতা না হইয়াও রোহিণী এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিল। হত্যা করিবার পূর্ব্বে রোহিণীকে সম্বোধন করিয়া গোবিন্দলালও বলিয়াছিল—"পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়াছিলাম।" বস্তুতঃ এখন তাহার বাড়ী হইয়াছে, পরিচর্য্যার জন্য ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছে, আর তাহাকে ব্রহ্মানন্দের জন্য নিত্য রাঁধিতে হয় না, কলসীকক্ষে বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতেও যাইতে হয় না। ইহা ব্যতীত ফুলবাগান, সাজ-সজ্জা প্রভৃতি বিলাস-ব্যসনের কিছুরই অভাব নাই। এককথায় বলিতে গেলে, প্রসাদপুরে রোহিণী রাজরাণী হইয়া বসিয়াছিল। এখন ইচ্ছা করিলে সে সুগৃহিণী হইয়া কাল কাটাইতে পারিত। কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া সে ভোগের পথই অনুসরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কারণ ইহাতেও তাহার পরিতৃপ্তি সাধিত হইতে পারে নাই। পৃথিবীতে কেহই পরিতৃপ্ত

হইতে পারে না, লক্ষপতিও নহে, যতদিন সে উদ্দাম কামনাকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে না পারে। রোহিণীর পক্ষে ইহা সম্ভবপর কি? কামনার তাড়নায় সে হরলালকে বিবাহ করিতে গিয়াছিল। আবার তাহারই প্রভাবে গোবিন্দলালকে লইয়া কুলত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। সংযম সে জীবনে কখনও অভ্যাস করিতে পারে নাই। ইহা রোহিণীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই গ্রন্থকার আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রসাদপুরের কুঠিতে আসিয়াও আমরা দেখিতেছি, রোহিণী তবলা বাজাইতেছে, এবং মুসলমান ওস্তাদের নিকট গান শিখিতেছে। কামনার ইন্ধন প্রজ্জ্বলিত করিয়া রোহিণী ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছিল। ইহা রোহিণীর উপযুক্তই হইয়াছে। তাহার ন্যায় স্ত্রীলোকের পক্ষে যে ইহা অত্যাবশ্যক তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

এমন সময়ে নিশাকর আসিয়া প্রসাদপুরে উপস্থিত হইল। গোবিন্দলালের উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে নিশাকর ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিল, এক পরমাসুন্দরী জানালায় দাঁড়াইয়া তাহাকে

দেখিতেছে। রোহিণীও তাহাকে দেখিয়া ভাবিল—"বেশভূষার রকম-সকম দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, বড়মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রং ফরসা—কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল। বিশেষ চোখ। আ মরি! কি মুখ! এ কোথা থেকে এলো?" ইহার পরে যখন নিশাকর গোবিন্দলালের কক্ষে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, তখন সে দেখিল, পর্দ্দার পাশ হইতে একটি পটলচেরা চোখ তাহাকে দেখিতেছে। সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলে, রোহিণীই রূপো চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, সে গোপনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। অবশেষে চিত্রার ঘাটে উভয়ের সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

রোহিণীর এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, বঙ্কিমবাবু যেন রোহিণীকে যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া হত্যা করিতেছেন। কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক হইয়াছে কি না তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, যেদিন বারুণীর সোপানে গোবিন্দলাল

"চম্পকনির্ম্মিত মূর্ত্তিবৎ চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে" রোহিণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিন হইতে গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত হইতেছিল। তারপর রূপ ও ভোগের মোহে সে নারীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। নিশাকরকে দেখিয়াও তাহার রূপের সহিত গোবিন্দলালের রূপ মনে মনে তুলনা করিয়া সে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, মুখ-চোখের সৌন্দর্য্যে নিশাকর গোবিন্দলাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে যে বিত্তশালী এই ধারণাও তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। অতএব রূপ ও ভোগের মোহাবিষ্টা রোহিণীর ন্যায় রমণীর পক্ষে নিশাকরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক হইয়াছে কি ?

দ্বিতীয়তঃ—রোহিণী রমণী হইয়াও প্রকৃত-পক্ষে মধুপবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। পুরুষগুলি তাহার নিকটে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। হরলালের নিকট প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সে গোবিন্দ-লালকে আশ্রয় করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এখন "নিশাকরকে দেখিয়া অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না

শরবিদ্ধ করিবে?" অথবা "নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে?" এইরূপ মনোবৃত্তির বশীভূত হওয়াও তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক হয় নাই।

তৃতীয়তঃ—রোহিণী যে নিশাকরের নিকট প্রেম-নিবেদন করিয়াছিল, ইহাও তাহার পূর্ব্বাভ্যাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র। হরলালের সহিত সে বিবাহ ব্যাপার লইয়া ঝগড়া করিয়াছিল, এবং গোবিন্দলালকেও তাহার রূপমদিরা পান করাইবার জন্য সে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিয়াছে। অতএব এই ব্যবসায় তাহার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

চতুর্থতঃ—গ্রন্থের পরিণতির দিক্ দিয়া বিচার করিলেও ইহা সমর্থিত হইতে পারে। এখানে প্রধান বিচার্য্য বিষয় এই যে, এই গ্রন্থে রোহিণী প্রতিনায়িকা মাত্র। প্রয়োজনবোধে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, এখন কার্য্য সমাপনান্তে সে বিদায় গ্রহণ করিতেছে। তাহার হত্যাতেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হয় নাই, কিন্তু ইহা পরবর্ত্তী

আখ্যায়িকার উপক্রমণিকারূপে কার্য্য করিয়াছে। এই ঘটনার পরে সন্থ হত্যাকারী গোবিন্দলাল আর হরিদ্রাগ্রামে মুখ দেখাইতে সাহস করে নাই। তাই জেল হইতে মুক্ত হইয়া সে পলায়ন করিয়াছিল, এবং মাধবীনাথ একাই হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। যখন রোহিণীকে লইয়া গোবিন্দলাল অতি গোপনে প্রসাদপুরে বাস করিতেছিল, তখন তাহার বিশ্বাস ছিল যে, এক ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত হরিদ্রাগ্রামের আর কেহই এই তত্ত্ব অবগত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মাধবী-নাথকে অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া গোবিন্দ-লালের আবাসস্থানের সন্ধান করিতে হইয়াছিল। রোহিণী-হত্যা ব্যাপারে এখন সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার শ্বশুর, ভ্রমর এবং হরিদ্রাগ্রামের সকলের নিকটেই এই গোপনীয় রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ভ্রমরের সহিত মিলনের পক্ষে বিশেষ অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। অবশেষে অভাবের তাড়নায় ছয় বৎসর পরে সে ভ্রমরকে পত্র লিখিতে বাধ্য হয়। এই ছয় বৎসরে ভ্রমরের জীবন-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল।

তবে কিনা এই সকল বিষয় গ্রন্থকার অতি দ্রুত বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ নিশাকর ও রোহিণীর সহিত পুনঃপুনঃ সাক্ষাৎ, এবং তাহার প্রতি দণ্ড ও পলের কামকেলির বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত করেন নাই। ইহার কৈফিয়ৎ গ্রন্থকার নিজেই দিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"এইখানে যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব।" অতএব এই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার জন্য গ্রন্থকারকে অপরাধী করা যায় না। বন্দরখালি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে বারুণীর প্রমোদ-উদ্যানে যখন গোবিন্দলালের সহিত রোহিণীর সাক্ষাৎ হইল, তখনও গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"সেখানে উভয়ের যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না।" বর্ত্তমানকালে এই সকল বিষয়ই বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত করিয়া মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ইহা যুগধর্ম্ম। বঙ্কিম ভিন্ন আদর্শে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা

বোধ হয় কোন কোন পাঠকের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই সকল বিষয় অবলম্বনে মনে মনে বিরাট মহাভারত রচনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন।

এখন আমরা রোহিণীর জীবন-নাট্যের পঞ্চমাঙ্কে উপনীত হইতেছি। রোহিণী অভিসারে বহির্গত হইয়াছে। তাহার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে দেখিয়া নিশাকর বলিল—"মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।"

রোহিণী—"আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হ'লে আমার দশা এমন হইবে কেন? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এ দেশে আসিয়াছি, আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।" ইহার পর তৃতীয় নায়কের নিকটে উপস্থিত হইলেও রোহিণী এই ভাষাই ব্যবহার করিত।

তারপর হত্যার পূর্ব্বে যখন গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"রোহিণি, তুমি আমার কে?" তখন সে উত্তর করিয়াছিল—"কেহ নহি, যতদিন পায়ে রাখেন ততদিন দাসী, নহিলে কেহ

নই।" এই উক্তি সঙ্গতই হইয়াছিল। গোবিন্দলালের সহিত সে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয় নাই, অতএব তাহার বাধ্যবাধকতাও ছিল না। এই জাতীয় মিলন প্রকৃতই ক্ষণভঙ্গুর। রোহিণী ইহা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিল। যে অবস্থায় আসিয়া সে উপনীত হইয়াছে, তাহাতে এক আশ্রয় অপসারিত হইলে অন্য আশ্রয় অবলম্বন করা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু রোহিণীর প্রার্থনানুযায়ী গোবিন্দলাল রোহিণীকে পরিত্যাগ না করিয়া হত্যা করিল কেন, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। এই ঘটনাতেই গ্রন্থকার তাহাদের প্রণয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। পুরুষ ও রমণীর প্রণয়-ব্যাপারে কোন পুরুষ স্বেচ্ছা-প্রাণোদিত হইয়া কোন ভ্রষ্ট-চরিত্রা রমণীর সহিত অবৈধ সাহচর্য্যে লিপ্ত হইলে, সেই রমণীর বিশ্বাস-ঘাতকতায় তাহার মনে অনুতাপ এবং আত্মগ্লানির উদয় হয়। আর তাহার ফলে সে ঐ রমণীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ ঘটনায় সাধারণতঃ হত্যাকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। যেখানে হয়, সেখানে তাহার অন্যবিধ কারণ থাকে। কিন্তু

পুরুষই হউক, কি স্ত্রীলোকই হউক, সে যদি অন্যকে বিপথগামী করিয়া পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়, এবং এইরূপ ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ নরহত্যা হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, রোহিণীই পুনঃপুনঃ প্রণয় নিবেদন করিয়া গোবিন্দলালের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। এখন তাহারই বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাইয়া গোবিন্দলালের পক্ষে অত্যধিক উত্তেজিত হওয়া অস্বাভাবিক হয় নাই। বস্তুতঃ হত্যার পূর্ব্বে সে রোহিণীকে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছিল—"রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ্, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছি, তুমি কি, রোহিণি, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম।" এই ত্যাগের পরিবর্ত্তে সে যাহা লাভ করিয়াছে, আজ তাহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্যই রোহিণীকে হত্যা করিবার প্রেরণা সে লাভ করিয়াছিল। এখানে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, গোবিন্দ-লাল রোহিণীকে হত্যা করিল বটে, কিন্তু তাহার

পূর্ব্বেই রোহিণী গোবিন্দলালের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়াছিল। রোহিণীর হত্যা তাহারই প্রতিক্রিয়া মাত্র।

অন্যদেশের বিখ্যাত কবিগণ-কর্ত্তৃকও এইরূপ হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করান হইয়াছে। তন্মধ্যে এখানে আমরা ওথেলো-কর্ত্তৃক ডেস্‌ডিমোনার হত্যা-ব্যপারের উল্লেখ করিতেছি। বিবাহ করিয়া ওথেলোই লাভবান হইয়াছিল, ত্যাগের পরিমাণ ডেস্‌ডিমোনার পক্ষেই অসাধারণ। তথাপি সেক্সপীয়র তাহা-দ্বারা ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যা করাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে প্রথমেই পুরুষ-প্রকৃতির পরস্পর সম্বন্ধ লইয়া আলোচনা করিতে হয়। সাঙ্খ্যের মতে পুরুষ স্বভাবতঃ উদাসী, কিন্তু প্রকৃতির সাহচর্য্যেই তাহার বন্ধন-দশা। বাস্তব জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায়, এই উদাসী পুরুষ প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া সংসার-রূপ মধুচক্র গঠিত করিয়া থাকে। এই জন্যই ইঁট-পাথরের বাড়ীকে গৃহ বলা হয় না, গৃহিণীই · গৃহ-পদবাচ্য। তাহাকেই অবলম্বন করিয়া পুরুষের অপরিমিত

কর্ম্মশক্তি দানা বাঁধিয়া এক বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করে। অপরিমিত বিশ্বাস এই ইমারতের ভিত্তি স্বরূপ। ইহার ব্যতিক্রম হইলে, উভয়েই উভয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারে,—কেন এই প্রতারণা করিয়া আমার যাবতীয় পরিশ্রম পণ্ড করিয়া দিলে! এখানে আমরা পুরুষের দিক্‌টাই বিবেচনা করিতেছি। রমণীর দিক্ ভ্রমর-সম্বন্ধীয় আলোচনায় বিশ্লেষিত হইবে। ওথেলো এবং গোবিন্দলাল উভয়েই এই বিরাট প্রতারণার সন্ধান পাইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হত্যা ইহার চরম শাস্তি। ইহা প্রদান করা, বা গ্রহণ করা চরিত্রবিশেষের শক্তি-সামর্থ্যের উপরে নির্ভর করে। ইহারা উভয়েই আঘাত করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রত্যাঘাত গ্রহণ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। উভয় কবিই এই দুই চরিত্রে এইরূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তথাপি ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য নিজ চক্ষে দর্শন করিয়া গোবিন্দলাল তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিল। আর একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ওথেলো ততোধিক

নির্ম্মমতার সহিত নিরপরাধা প্রণয়িনীকে ধরা হইতে অপসারিত করিয়াছে। শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমের দক্ষতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। *রোহিণীকে মারিয়া ফেলিয়া বিরাট সম্ভাবনার দ্বার* রুদ্ধ করা হইয়াছে, এইরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু এই সম্ভাবনা কি? রোহিণীর চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, গোবিন্দ-লাল দ্বারা পরিত্যক্তা হইলে সে নিশাকরের ন্যায় অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিত। নিশাকরের সহিত আলাপে সে এইরূপ মনোবৃত্তিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। তৎপর গোবিন্দলালের নিকট শেষ প্রার্থনাতেও ইহা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ডেস্‌ডিমোনা আর কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র বাঁচিয়া থাকিলে প্রিয়তমের সহিত দৃঢ়তর প্রীতির বন্ধনে জীবন যাপন করিতে পারিত। অতএব সম্ভাবনার প্রশ্ন ডেস্‌ডিমোনার সম্বন্ধেই উত্থিত হইতে পারে, রোহিণীর সম্বন্ধে নহে। আবার গ্রন্থ লইয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, উক্ত কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিলেই সমগ্র ষড়যন্ত্রটি ওথেলোর নিকটে প্রকাশিত হইয়া পড়িত, তখন দুষ্কৃতকারিগণের

শাস্তিতে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত, এবং ওথেলোও অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃত প্রেমিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত, আর এই *বিয়োগান্ত নাটকের মিলনেই পরিসমাপ্তি* ঘটিত। তখন আমাদের ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের বিধির প্রশংসা করিয়া দর্শকগণও অভিনয়ান্তে হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন। এতগুলি সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কবি ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যা করাইয়া ট্রাজিডি রচনা করিয়াছেন, এবং হত্যাতেই গ্রন্থের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই জন্য সেক্সপীয়র অপরাধী হইয়াছেন কি?

এখন কৃষ্ণকান্তের উইল লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। রোহিণীর হত্যার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহেন—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দার-

ঘর্ষণপীড়িত-বাসুকি-নিশ্বাস-নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি-ভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে। ** তখন সেই পূর্ব্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমর-প্রণয়সুধা ** দিবা-রাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। * * তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথাই এই আখ্যায়িকা লিখিলাম।” ইহাতেই গ্রন্থকার রোহিণীর হত্যা সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। এখানে ভ্রমর ও রোহিণী-চরিত্রের পরিকল্পনার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। রূপে ও গুণে রমণী পরিপূর্ণতা লাভ করে। বঙ্কিম এই পরিপূর্ণ নারীত্বকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া রূপ ও গুণের পৃথক্ প্রতিমূর্ত্তিরূপে রোহিণী ও ভ্রমরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে রূপ অর্থে বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্য, আর গুণ অর্থে সুকোমল হৃদয় বৃত্তি, যাহা মানুষের চরিত্রকে মহনীয় করিয়া তোলে। রূপের মাধুর্য্যে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, আর

গুণের মহিমা আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করি। রূপ বাহ্য দেহ অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু গুণের এইরূপ সহজ অভিব্যক্তি নাই, ইহা অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া কার্য্যের মধ্য দিয়া রূপত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই ভ্রমর কাল, আর রোহিণীর "রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল, শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ।" গ্রন্থকার রোহিণীকে গুণহীন রূপের, এবং ভ্রমরকে রূপহীন গুণের প্রতীক করিয়া গোবিন্দলালকে পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের প্রভাবাধীনে আনয়ন করিয়াছেন। গোবিন্দলাল ভ্রমর-প্রেম-পরিতৃপ্ত হৃদয়ে প্রগাঢ় শান্তির সহিতই বাস করিতেছিল। তাহার হৃদয়ে চঞ্চলতা ছিল না, অন্য কোন রমণীর প্রতি আসক্তির কল্পনাও তাহার মনে উদিত হয় নাই। এমন সময়ে রোহিণী তাহার রূপ-সম্ভার লইয়া গোবিন্দলালের হৃদয়দ্বারে পুনঃপুনঃ আঘাত করিয়া তাহার তপোভঙ্গ করিতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া আত্মহত্যায় ব্রতী হইয়াছিল। যাহা এইরূপে স্বেচ্ছায় লোপ পাইয়া যাইতেছিল, গোবিন্দলাল তাহাই পুনর্জীবিত করিবার কালে সেই উন্মুক্ত রূপের প্রভায়

বিচলিত হইয়া পড়িল। তারপর বিবিধ প্রতিকূল ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ও অভিমানের উত্তেজনায় গোবিন্দলাল ভোগসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল। এইরূপ পতন স্বভাবতঃ ক্ষণস্থায়ী, ভোগের নেশা কাটিয়া গেলেই মোহের প্রভাব দূরীভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে রোহিণী নিলাজী বীজের ন্যায় গোবিন্দলালের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছিল। তাই রোহিণীর সাহচর্য্যে ভোগ ও সুখের তারতম্য উপলব্ধি করিয়া অচিরেই গোবিন্দলালের হৃদয় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন সে বুঝিতে পারিল—"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই, তাহা চাই না।" অতএব বাত্যা-বিক্ষুব্ধ জলধি যখন শান্তভাব ধারণ করিল, তখন ভ্রমর-চন্দ্রিমায় তাহার হৃদয় আবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বামিত্রের পতন হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া একবার চক্ষু ফিরাইয়া লইলে, আর কোন অপ্সরাই আসিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। ইহাকেই বলে ভোগের অত্যন্ত নিবৃত্তি। গোবিন্দলালের প্রত্যাবর্ত্তনের পক্ষেও ইহার অত্যন্ত নিবৃত্তি বা

রোহিণীর হত্যা—এক অপরিহার্য্য ঘটনা মাত্র। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন "অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'রোহিণীকে মারিলেন কেন?' অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি—'আমার ঘাট হইয়াছে।' কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা-সকলের ব্যাখ্যামাত্র। এ কথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।" (বঙ্গ-দর্শন, ১২৮৪ সাল, ৪৬৬ পৃঃ)। "অতএব রোহিণীর অকস্মাৎ মৃত্যু যেন একটা খুব জটিল সমস্যার অন্যায়রূপ সুলভ সমাধান"(বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৮২ পৃঃ) ইহা বলা যাইতে পারে না। উদ্ধৃত উল্লেখে যাহা জটিল সমস্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে জটিলতার লেশ-মাত্রও নাই, আর থাকিলেও তাহা গোবিন্দলালের পক্ষেই, রোহিণীর পক্ষে নহে। কারণ পরবর্ত্তী ঘটনায় দেখা যায় যে, পরস্পরের বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য উভয়েই প্রস্তুত হইয়া

বসিয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের ছিল বিবেক, তাই রোহিণীর সাহচর্য্যে অতৃপ্তিতে হৃদয় ভরিয়া উঠিলেও সে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে নাই। অপর পক্ষে ভোগের মোহাবিষ্টা রোহিণী সুযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্রই তাহা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দলাল স্বচক্ষে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া এই বিরাট অন্যায়ের শাস্তিবিধান করিয়াছে মাত্র। অতএব অন্যায়ের যে কল্পনা করা হইয়াছে তাহা গোবিন্দলালের পক্ষে হইতে পারে না। সাধারণতঃ এইরূপ অবস্থায় রোহিণীরই গোবিন্দলালকে জড়াইয়া থাকা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া সে নিজেই শিথিল গ্রন্থির ডোর ছিন্ন করিয়া পলাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহাতে অন্যায়ের বোঝা সে স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া তাহার কার্য্যের অনুরূপ শাস্তিলাভ করিয়াছে। এইত গেল পাত্রপাত্রীর সম্বন্ধে, কিন্তু গ্রন্থকারের পক্ষে অন্যায় হইয়াছে কিনা তাহাও বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। অভিনেতৃগণ তাহাদের দোষগুণ অনুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ করিলেই গ্রন্থকার

অন্যায়ের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। (Poetic Justice means that prosperity and adversity are distributed in proportion to the merits of the agents.—Bradley's Shakespearean Tragedy, p.31) অতএব রোহিণীর হত্যায় বঙ্কিমকে অপরাধী করা যাইতে পারে কি ?

এই অবসরে একটু তত্ত্বালোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়াই মনে করি। এই উপাখ্যানে গোবিন্দলালের ক্রমিক উন্নতির স্তর নির্দ্দেশিত হইয়াছে। রোহিণীর হত্যায় মোহের জাল ছিন্ন করিয়া গোবিন্দলালের চিত্ত আবার ভ্রমরের প্রতি ধাবিত হইল। এই সময়ে ভ্রমর ধরা দিলে, গোবিন্দলালকে পার্থিব সুখের বন্ধনেই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত। তাই গোবিন্দলালকে পুনরায় আকৃষ্ট করিয়া ভ্রমর ধীরে ধীরে যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল দেখিল, তাহার পার্থিব ভোগ এবং সুখ উভয়ই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় শান্তি পাইবার জন্য সে ভগবৎ-পাদপদ্মে

মনঃস্থাপন করিয়া ভ্রমরাধিক ভ্রমরকে লাভ করিয়াছিল। ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মন, কিন্তু মনোবৃত্তির নিবৃত্তি না হইলে চিরশান্তি লাভ করা যায় না। গ্রন্থের উপসংহারে কবি এই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন। ইহা কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা শাস্ত্রের জয়গান নহে, মানব মনের ক্রমিক উন্নতির স্তর নির্দ্দেশার্থে সর্ব্ব-দেশে সর্ব্বশাস্ত্রেই এই তত্ত্ব নানাভাবে প্রচারিত হইয়াছে।[১]

১। এই বিষয় পরে পুনরায় আলোচিত হইবে।

গোবিন্দলাল ও ভ্রমর

সৃষ্টির আদিকালে ব্রহ্মার ললাট হইতে সমুৎপন্ন অর্দ্ধনারীনর-বপু অতিকায় প্রচণ্ড রুদ্র নিজ দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব বিশিষ্ট মানবের আদি মাতা ও পিতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ, ১।৭।১০-১২)। পাশ্চাত্য দর্শনেও অনুরূপ পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিভিন্নতা এই যে, এই জাতীয় জীব বলদর্পিত হইয়া নাকি ভগবানের অধিকার লোপ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের শাস্তি বিধানের জন্য দেবগণ বজ্রদ্বারা তাহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া পৃথক্ স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (Plato's Banquet)। ইহার ফলে এক অদ্ভুত নাট্যলীলার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল। পৃথকীকৃত স্ত্রী-পুরুষেরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া দেখিতেছিল, তাহাদের সেই পূর্ব্ব পূর্ণতা ফিরিয়া আসে কিনা। আহার নাই, নিদ্রা নাই, অবিরত অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহারা একই উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতেছে। ইহাতে ক্রমে ক্রমে শক্তিহীন

হইয়া যখন তাহারা ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাহাদের মঙ্গলার্থে দেবগণ প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রেমের আলোক প্রজ্জ্বালিত করিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য, ইহার সাহায্যে তাহারা বিচ্ছিন্ন অংশ সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে। এইরূপে মিলনের সুযোগ সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু বিচার-বুদ্ধির অভাবে আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে অন্যের অর্দ্ধাংশের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে হইল বিরোধ ও বিচ্ছেদের সৃষ্টি। জগতে এখনও এই জাতীয় মিলন সতত সংঘটিত হইতেছে। অমিল অর্থে অসম-মিলন। একমাত্র সমত্বই পূর্ণতা সম্পাদিত করিতে পারে। এখন দেখিতে হইবে, গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মিলনের প্রকৃত স্বরূপ কি ?

ভ্রমরের সহিত প্রথম সাক্ষাতে আমরা তাহাকে গোবিন্দলালের সহধর্ম্মিণীরূপেই দেখিতে পাই। প্রভাতে গোবিন্দলাল মুক্ত বাতায়ন-সমীপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময়ে ভ্রমর আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

গো—"আবার তুমি এখানে কেন ?

ভ্র—তুমি এখানে কেন ?

গো—আমি একটু বাতাস খেতে এলেম, তাও কি তোমার সইল না ?

ভ্র—স'বে কেন ? এখনই আবার খাই খাই ? ঘরের সামগ্রী খেয়ে মন উঠে না, আবার মাঠে ঘাটে বাতাস খেতে উঁকি মারেন !

গো—ঘরের সামগ্রী এত কি খাইলাম ?

ভ্র—কেন, এইমাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ।" ইহার পরে গোবিন্দলাল নথ নাড়ার কথা উত্থাপন করিলে ভ্রমর নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্য নথ খুলিয়া একটা হুকে রাখিয়া গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, ভ্রমরের এই ব্যবহারে প্রাচ্য আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনই কারণ নাই। বঙ্কিমবাবুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই এদেশে মাধুর্য্য-ভাবাত্মক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। জয়দেবের "দেহি পদপল্লবমুদারম্"এর পরে বহু বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণকে দিয়া নানাভাবেই রাধার পরিচর্য্যা করাইয়াছেন, এবং আমার বিশ্বাস,

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই প্রয়োজন বোধে ইহা করিয়া থাকিবেন। ইহাতে কোন আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় কি ? না, ইহাতে প্রেমের গভীরতাই প্রকাশিত হইয়া থাকে ? রাখালগণ কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি কোন্ বড়লোক, তুমি আমি সম।" এইভাবে উভয়ে সমপর্য্যায়ে আসিয়া মিলিত না হইলে দুইটি প্রাণ এক হইয়া যাইতে পারে না। ইহাতে ভেদবুদ্ধি এবং বড় ছোট ভাব অন্তর্হিত হইয়া যায়। আর এই সমত্বই পূর্ণতা সম্পাদিত করে। অতএব ভ্রমর গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া কোন বিজাতীয় ভাবের পরিকল্পনা করা সঙ্গত নহে। গ্রন্থকার এই ঘটনায় ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, ভ্রমর সম্পূর্ণরূপে গোবিন্দলালকে আয়ত্ত করিয়া নিজের অস্তিত্বের সহিত মিশাইয়া দিয়াছিল। এই অবস্থায় গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দেওয়া এবং নিজের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে যে কোন পার্থক্য আছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। পরবর্ত্তী একটি ঘটনাতেও ভ্রমর ধাঁ করিয়া গোবিন্দলালের গালে এক ঠোনা মারিয়া দিয়াছিল।

পাঠকের হয়ত ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে। কিন্তু যে সেই আঘাত সহ্য করিল, সে তখনই ভ্রমরের স্কন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া তাহাকে আদর জানাইয়াছিল। ইহা প্রণয়ের লীলা মাত্র, প্রেমের গভীরতার পরিচায়ক। গ্রন্থকার তাঁহার নিপুণ তুলিকার দুই একটি কোমল স্পর্শে ইহাদের প্রণয়ের স্বরূপ এইভাবে প্রকটিত করিয়া দিয়াছেন। যাহা অন্যভাবে ব্যখ্যা করিতে হইলে হয়ত এক অধ্যায় লিখিতে হইত, তাহাই অতি সংক্ষেপে তিনি দুই একটি ঘটনায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহাই বঙ্কিমের রচনার বিশেষত্ব।

তারপর, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে। চাকরাণী মহলে এই সংবাদ অবগত হইয়া ভ্রমর গোবিন্দলালের নিকটে তাহা বর্ণনা করিল। শুনিয়া গোবিন্দলাল ঘাড় নাড়িল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল—ঘাড় নাড়িলে যে?

গো—আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয়?

ভ্র—না।

ইহার পর গোবিন্দলাল পীড়াপীড়ি করিয়া ভ্রমরের অবিশ্বাসের কারণ জানিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না, লজ্জা-বনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল। ইহার পরেই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"রোহিণী যে নিরপরাধিনী ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যতদূর বিশ্বাস, ভ্রমর উহার নির্দ্দোষিতায় ততদূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না—কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছিলেন যে, 'সে নির্দ্দোষ, আমার এইরূপ বিশ্বাস।' গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।" এখানে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, ভ্রমরও নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে গোবিন্দলালের অস্তিত্বের সহিত মিশাইয়া দিয়াছিল, তাহার নিজের কোন পৃথক্ সত্তা ছিল না। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনায় আমরা দেখিয়াছিলাম, ভ্রমর সম্পূর্ণরূপে গোবিন্দলালকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল, এখন আমরা দেখিতে পাইলাম, সে নিজেকেও গোবিন্দলালের অস্তিত্বের সহিত বিলীন করিয়া দিয়াছে। পূর্ণ মিলনে এইরূপেই দুইটি

উপাদান নিজেদের পৃথক্ সত্তা লোপ করিয়া পরস্পরের সহিত মিশিয়া যায়।

ইহা ঝড়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। গ্রন্থের পরবর্ত্তী অংশে গ্রন্থকার ইহাদিগকে লইয়া যে আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন, তাহারই ভিত্তিরূপে তিনি উক্ত তিনটি মাত্র ঘটনায় ইহাদের প্রণয়ের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। আমরা দেখিয়াছি যে, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর কামলীলা বর্ণনায় তিনি যথোচিত সংযমের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের প্রণয়-বিশ্লেষণেও সেইরূপ অযথা গল্পের জাল বুনিয়া গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত করেন নাই। ইহাই ছিল বঙ্কিমের আদর্শ। দীর্ঘ অভিযানের পথ-নির্দ্দেশক চিহ্নগুলিই তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলে সৌন্দর্য্যানুভূতির অভাব হইতে পারে না বলিয়া আমরাও বিশ্বাস করি।

গোবিন্দলাল যে কালো ভ্রমরের গুণমুগ্ধ ছিল ইহার উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, ভ্রমরের গুণ কি? গোবিন্দলালের প্রতি তাহার অগাধ ভালবাসা ছিল, একমাত্র ইহার

প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থকার উক্তপ্রকার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন কিনা ইহাও বিচার্য্য বিষয়।

স্বামী-স্ত্রী গভীর প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়া কাল যাপন করিতে পারে, ইহা তাহাদের ঘরের কথা। কিন্তু সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে তাহাদিগকে অন্যের সংস্পর্শেও আসিতে হয়। অতএব অপরের সহিত ব্যবহারেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, বারুণীর ঘাটে রোহিণীকে কাঁদিতে দেখিয়া গোবিন্দলালের চিত্তে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, এবং সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই রোহিণীকে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। তাহার সেই সময়ের মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া গ্রন্থকার ভালরূপেই গোবিন্দলালের মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভ্রমরকেও তিনি ঐরূপ দেবোপম স্বামীর উপযুক্ত গৃহিণী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। বঙ্কিম লিখিয়াছেন—"চাকরাণী-সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত না।" ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন—"ভ্রমর নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিলেন না।" অর্থাৎ দাসদাসীর

প্রতি কঠোর ব্যবহার করা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। তাহার ঈষৎ তিরস্কারে যখন চাকরাণীদের মধ্যে "দুই একজন চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল" তখনও "ভ্রমর কাতর" হইয়াছিল। ইহাও তাহার কোমল অন্তঃকরণেই পরিচয় প্রদান করে। তারপর রোহিণীর নিকট হইতে চুরির বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য যখন গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিল—"আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয় অন্তরাল হইতে শুনিও", তখন "ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল। একেবারে পাক-শালায় উপস্থিত হইয়া পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল,—রাঁধুনি ঠাকুরঝি! রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে একটি রূপকথা বল না।" গ্রন্থকার বলিয়াছেন, ভ্রমর বালিকা। আমরা দেখিতেছি কেবল বয়সে নহে, চপলতাতেও। সপ্তদশ-বর্ষীয়া যুবতীর এই ব্যবহারে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দিন গণিয়া তাহার বয়সের হিসাব করা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাই ভ্রমরের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু উত্তেজনার

কারণ উপস্থিত হইলে সে তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। ইহার প্রথম পরিচয় আমরা পাই, যখন ক্ষীরী চাকরাণী গোবিন্দলাল ও রোহিণীর প্রণয়ঘটিত কাল্পনিক কাহিনী ভ্রমরের নিকট ব্যক্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে কিল চড় পুরস্কারস্বরূপ লাভ করিয়াছিল। তখন ক্রোধে ও দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে ভ্রমর বলিয়াছিল—"আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজি যে, আমার স্বামীর কথা পাঁচী চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? তুই এতবড় কথা আমাকে বলিস্?" এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভ্রমরের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছে, এবং তাহা সে সহ্য করিতে পারে নাই বলিয়াই ক্রোধে ও দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষীরীর প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছে। এই আত্মসম্মানবোধই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, এবং ভ্রমর-চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। কিন্তু সংযম-শক্তিরও তাহার অভাব নাই। রোহিণী ধার-করা গহনার পুটুলি লইয়া ভ্রমরের নিকট আসিয়াছে। "তাহাকে দেখিয়া বিষের জ্বালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল" বটে,

কিন্তু এই অবস্থাতেও সে প্রভূত আত্ম-সংযমের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। রোহিণী যখন বলিল —"মেজবাবুর অনুগ্রহে আমার আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই," তখন ভ্রমর—"তুমি এখান হইতে দূর হও" কেবল মাত্র ইহাই বলিয়া তাহার বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়াছিল। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল কিন্তু রোহিণীকে একটি কিলও মারিল না। আমাদের পাঠিকারা উপস্থিত থাকিলে রোহিণীকে যে স্বহস্তে প্রহার করিতেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই।" বস্তুতঃ এইরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ এই জাতীয় অভ্যর্থনাই হইয়া থাকে। কিন্তু ভ্রমর সংযত ব্যবহারে "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ" এই নীতি-বাক্যের দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করিল। জল অগ্নির সংস্পর্শে উত্তপ্ত হয় বটে, কিন্তু স্নিগ্ধতাই তাহার সহজাত প্রকৃতি।

তারপর যখন গোবিন্দলাল রোহিণীকে কৃষ্ণকান্তের কবল হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে গমনোদ্যত হইল, তখন ভ্রমর তাহার

কাপড় ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা যাও ?"

গো—"কোথা যাই, বল দেখি ?"

ভ্র—"এবার বলিব ?"

গো—"বল দেখি ?"

ভ্র—"রোহিণীকে বাঁচাইতে।"

"তাই" বলিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখ চুম্বন করিলেন। গ্রন্থকার ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"পরত্বঃখকাতরের হৃদয় পরত্বঃখকাতরে বুঝিল—তাই—গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখচুম্বন করিলেন।" ভ্রমর স্বামীকে চিনিত, তাই তাহার মনের কথা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল। আর গোবিন্দলালও বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ভ্রমরের হৃদয়তন্ত্রীও তাহার ন্যায় সমবেদনার সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাই মুখচুম্বন করিয়া ভ্রমরকে তাহার আন্তরিক প্রীতি জানাইয়া দিল। এই মুখচুম্বন প্রেমের লীলাখেলা নহে, ইহা গুণের পুরস্কার মাত্র। আমরা দেখিতেছি যে ভ্রমর কেবল প্রেম বিলাইয়াই গোবিন্দলালকে মোহিত করে নাই, কিন্তু এই

সকল গুণের আকর্ষণীতেও তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে গুণ না থাকিলে প্রেমও স্থায়ী হয় না। রূপ ও যৌবন প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে বটে, কিন্তু গুণেই ইহার স্থায়িত্ব সম্পাদিত হয়। গ্রন্থকার এখানেও কয়েকটি ঘটনায় সংক্ষেপে ভ্রমরের বিবিধ গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এইজন্যই কালো ভ্রমরকে গোবিন্দলাল এত ভালবাসিত। ভ্রমরের অন্তঃপ্রকৃতি বিশ্লেষিত করিলে এই সকল তথ্যই অবগত হওয়া যায়। কিন্তু হৃদয়ের যাবতীয় বৃত্তি-গুলির মধ্যে প্রধানতঃ প্রেমের বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি লইয়াই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অতএব ভ্রমরের প্রেমের সন্ধান লওয়াই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। ইহার স্বরূপ ইতিপূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন ইহার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

গোবিন্দলাল বন্দরখালি চলিয়া গিয়াছে। তখন—"কিছু ভাল লাগে না—ভ্রমর একা। ভ্রমর শয্যা তুলিয়া ফেলিল—বড় গরম। খাটের পাখা খুলিয়া ফেলিল—বাতাস বড় গরম।

চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে বারণ করিল—ফুলে বড় পোকা। তাস খেলা বন্ধ করিল—সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ করেন। স্থচ, স্থতা, উল, পেটার্ণ সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিল—জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বড় চোখ জ্বালা করে। বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে গৃহ পরিপূর্ণ। মাথার চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পর্ক রহিত হইয়া আসিয়াছিল—উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে তুলিত,—জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রমর হাসিয়া চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোঁপায় গুজিত, ঐ পর্য্যন্ত। আহারাদির সময় ভ্রমর নিত্য বাহানা করিতে আরম্ভ করিল, আমি খাইব না, আমার জ্বর হইয়াছে। শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া পাঁচন ও বড়ীর ব্যবস্থা করিয়া ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন যে, 'বৌমাকে ঔষধগুলি খাওয়াইবি।' বৌমা ক্ষীরীর হাত হইতে বড়ী-পাঁচন কাড়িয়া লইয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।" অর্থাৎ স্বামীর প্রবাস-গমনে ভ্রমর যাবতীয় ভোগ-

বিলাস পরিত্যাগ করিয়াছিল। বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও লিখিত আছে যে, নায়ক যতদিন প্রবাসে থাকিবে, ততদিন নায়িকা শরীর পরিষ্কারে মনোযোগ দিবে না, অলঙ্কারও ধারণ করিবে না। (ঐ, ৪।২।৪৪)। বস্তুতঃ সাজসজ্জা কাহার জন্য? স্বামীর প্রীত্যর্থেই। যখন তাহার সম্ভাবনা নাই, তখন বেশভূষায় অন্যের প্রীতি আকর্ষণ করিবার প্রবৃত্তি পতিব্রতা রমণীগণের না থাকাই স্বাভাবিক। এখানে গ্রন্থকার ভ্রমরের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষিত করিয়া দেখাইলেন যে, গোবিন্দলালের অনুপস্থিতিতে তাহার জীবন তুর্বিবষহ হইয়া উঠিয়াছে। এই আত্মনির্য্যাতনে তাহাকে কঠোর ব্রতধারিণী উমার আদর্শেই সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। পতি-পত্নী অভেদাত্মা না হইলে এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রেরণা মনে জাগরিত হয় না। এই প্রাথমিক বিচ্ছেদে সে যে মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছে,—পরবর্ত্তীকালে তাহারই পরিণতিতে সে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই।

ইহার পরে গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আসক্তির কথা শুনিয়া ভ্রমর তাহাকে মরিবার নির্দ্দেশ দিয়া পাঠাইয়াছিল। নারীর মর্য্যাদাক্ষুণ্ণ-কারিণী রমণীর পক্ষে যে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ এইরূপ ধারণা ভ্রমরের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকা অসঙ্গত নহে। ইহা তাহার পূত-চরিত্রের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি মাত্র। তথাপি তাহার কথা শুনিয়া যে, রোহিণী সত্যই আত্মহত্যায় ব্রতী হইবে, এই সন্দেহ কখনও তাহার মনে উদিত হয় নাই। গোবিন্দলালকে সে স্পষ্টই বলিয়াছিল—"ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে, সে কি মরিতে পারে?" পতির প্রতি আসক্তির কি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন! ভ্রমর স্বীয় আদর্শে সমগ্র জগৎ পরিমাপ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু যাহাই হউক, তাহার মৃত্যুর নির্দ্দেশ যে রোহিণীর জঘন্য প্রবৃত্তির নিন্দামাত্র তাহা বলাই বাহুল্য। এজন্য ভ্রমরকে অপরাধিনী করা যায় না।

গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের প্রণয়ের স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ

সংঘটিত করিতে হইলে তদনুরূপ ঘটনার সমাবেশও অতীব প্রয়োজনীয়। আকর্ষণ যে প্রকারই হউক না কেন, বিকর্ষণ ততোধিক না হইলে কোন বন্ধনই ছিন্ন হইয়া যায় না। অতএব গ্রন্থকারকে এখানে প্রভূত সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, রোহিণীর পুনঃপুনঃ প্রেমনিবেদনেও গোবিন্দলাল বিচলিত হয় নাই। তাই গ্রন্থকার রোহিণীকে উদ্ধার করিবার ছলে ভ্রমরমুখী গোবিন্দলালের চিত্তকে সর্ব্বপ্রথম রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট করিবার সুযোগের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। প্রথমতঃ জল হইতে উদ্ধার করিবার কালে গোবিন্দলাল সেই যুবতী রমণীর গাত্রস্পর্শ নিবিড় ভাবেই লাভ করিয়াছিল। তারপর সিক্ত বসনাবৃত রোহিণীর কমনীয় দেহ দীর্ঘকাল তাহার চক্ষের সম্মুখে একপ্রকার অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় পড়িয়াছিল। দেখিয়া গোবিন্দলাল বলিয়া উঠিয়াছিল—"মরি, মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন!" ইহাতে গোবিন্দলালের অপরাধ হইয়াছে কি?

কোন সজীব পাঠক এইরূপ অবস্থায় পড়িলে যোগ অবলম্বন না করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারিতেন কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। পুরাণকারও এমন সুকৌশলে অপ্সরা মেনকাকে বিশ্বামিত্রের সম্মুখে উপস্থিত করেন নাই। তারপর রোহিণীর অধরে অধর স্থাপিত করিয়া গোবিন্দলালকে ফুৎকার দিতে হইয়াছিল, এবং সংজ্ঞালাভের পর রোহিণী বলিয়াছিল-—"রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না, আশাও নাই।" এতগুলি প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থকার গোবিন্দলালের চিত্ত বিচলিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি সে রোহিণীর নিকটে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে নাই, চিত্ত জয় করিবার জন্য বন্দরখালিতে চলিয়া গিয়াছিল। এইরূপে যে দুইটি উপাদান মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের একটিতে চঞ্চলতার সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থকার ধ্বংসের সূচনা করিয়া দিলেন।

কিন্তু একজন একদিকে ছুটিয়া চলিলেও অপরে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে। অতএব বিভেদ সৃষ্টির জন্য উভয়দিক্ হইতেই বিপরীতমুখী বেগের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। তাই এখন ভ্রমরের পালা। গোবিন্দলাল চলিয়া গেলে পর ভ্রমর ক্ষীরী চাকরাণীর নিকট হইতে সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিল যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি আসক্ত। তারপর বিনোদিনী, সুরধুনী প্রভৃতি অনেকে আসিয়া জানাইয়া গেল—"ভ্রমর, তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।" ইহাতে তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ভ্রমর ভাবিল—"সত্য না হইলে সকলে বলিবে কেন?" তথাপি সহসা সে স্বামীকে অবিশ্বাস করিতে পারে নাই। এমন সময় রোহিণী ধার করা গহনা লইয়া আসিয়া ভ্রমরকে বলিয়া গেল যে, গোবিন্দলাল তাহাকে তিন হাজার টাকার গহনা দিয়াছে। যে অপরাধী সেই যখন নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করিয়া গেল, তখন আর ভ্রমরের অবিশ্বাসের কোনই কারণ রহিল না। ইহার ফলে গোবিন্দলালকে বিশ্বাসঘাতক মনে

করিয়া ভ্রমর তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিল। তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"তুমি মনে জান, বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম ; কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তিযোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি ; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে চলিয়া যাইব।" ইহা দ্বারা গ্রন্থকার দেখাইলেন যে, ভ্রমরও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ভাঙ্গনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। যে ভ্রমর গোবিন্দলালের সহিত নিজের অস্তিত্ব মিশাইয়া দিয়া তাহার সিদ্ধান্তকেই নিজের সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিত, এখন সেই ভ্রমরের পত্রেই "তুমি" ও "আমি"র পার্থক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দলালের আলিঙ্গন হইতে

নিজেকে মুক্ত করিয়া যেন সে তাহার পৃথক্ সত্তা অনুভব করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। রোহিণীর রূপের মোহে গোবিন্দলাল বিচলিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভ্রমরকে সে ভুলিতে পারে নাই, বরং ভ্রমরের মঙ্গলার্থেই ব্যাকুল হইয়া সে নিজের চিত্ত পরিশুদ্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় বন্দরখালিতে চলিয়া গিয়াছিল। পাছে ভ্রমর ব্যথা পায়, এই ভয়ে সে রাত্রির ঘটনাও ভ্রমরের নিকট বলিতে পারে নাই। তাহার এই প্রচেষ্টা ভ্রমরকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। অথচ সেই ভ্রমরই অভিমানবশে আত্মহারা হইয়া গোবিন্দলালকে প্রথম আঘাত করিয়া বসিল! তাহার এই অভিমান সমর্থনযোগ্য কিনা ইহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়।

দম্পতির কলহে বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া হয়, ইহা বলা হইয়া থাকে। কলহের গণ্ডীকে অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়াই এই তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিতে যে কলহের উদ্ভব হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী, গাঢ়তর মিলনে অতি সহজেই ইহার পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু

ভ্রমরের অভিমান সেই পর্য্যায়ভুক্ত নহে। তাহার প্রেমের স্বরূপ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। গোবিন্দলালের সহিত তাহার চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হইবার প্রাক্কালে গ্রন্থকারও ভ্রমরের মুখ দিয়া গোবিন্দলালকে বলাইয়াছেন—"আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎ-সংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিতা, তোমার খেলিবার পুতুল, তোমার দাসানুদাসী বই ত নই।" এই অবস্থায় ঘটনাচক্রে প্রিয়তমকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া অভিমানিনী হওয়া তাহার পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই। অনুরূপ ঘটনায় গোবিন্দলাল রোহিণীকে, এবং ওথেলো ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যা করিয়াছিল। কর্ত্তব্যবোধে রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন। গৌতমের শাপে অহল্যা পাষাণে পরিণত হইয়াছিল, আর পরশুরাম পিতার আদেশে মাতৃহত্যা করিতেও বিরত হন নাই। কিন্তু ইহারা পুরুষ, আর ভ্রমর স্ত্রীলোক,

এইমাত্র প্রভেদ। স্বামী অপরাধী এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সে অভিমান-অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিল মাত্র। পুরুষ শারীরিক বলে বলীয়ান্, তাই হত্যা করিতে পারে, আর রমণী অপরিমিত মানসিক বলের অধিকারিণী বলিয়া ভ্রমর এই নির্ম্মম অসহযোগিতার পন্থা অবলম্বন করিতে পারিয়াছিল। হত্যার তুলনায় ইহা শ্লাঘ্যতর নহে কি?

দ্বিতীয়তঃ—ভ্রমরের আত্মসম্মানবোধও তাহাকে কাতর করিয়া ফেলিয়াছিল। সে জমিদার-গৃহের বধূ, তাহার উপর স্বামী রূপবান্, প্রেমময় ও সচ্চরিত্র। কালো ভ্রমর এইরূপে অতুল সম্পদের অধিকারিণী হইয়া দিন কাটাইতেছিল। গ্রন্থকারও বলিয়াছেন যে, তাহার এই সৌভাগ্য দেখিয়া অন্য রমণীরা হিংসা করিত। আজ গোবিন্দলালের অখ্যাতিতে সে বুঝিতে পারিল, তাহার গর্ব্বোন্নত মস্তক সকলের নিকট অবনত হইয়া পড়িয়াছে। এখন ক্ষীরী চাকরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া রামীর মা, পাঁচীর মা আসিয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়া যায়। এই অপমানে তাহার হৃদয়ে

5—O. P. 64

বিজাতীয় অভিমানের সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক হয় নাই।

তৃতীয়তঃ—দাম্পত্য-প্রেমের উচ্চতম আদর্শ গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকার এই আখ্যায়িকার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। রসশাস্ত্রে খণ্ডিতা নায়িকার উল্লেখ রহিয়াছে। অন্য রমণীর ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া নায়ক আসিয়া উপস্থিত হইলে তদ্দর্শনে খণ্ডিতার অভিমানের উৎপত্তি হয়, আবার স্তবস্তুতিতে ইহার প্রশমনেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু এখানে সেই জাতীয় মান-অভিমান লইয়া গ্রন্থ রচিত হয় নাই। গোবিন্দলাল ও ভ্রমর মিলনে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছিল। শাস্ত্রকারগণ এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আর কবি ও দার্শনিকেরা ইহাকেই মানবীয় প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে প্রচার করিয়াছেন। এই প্রেমের রাজ্যে প্রত্যেকেই সুবিচার ও সমব্যবহার দাবী করিতে পারে। যে ইহার অমর্য্যাদা করে, সে পুরুষই হউক, কি রমণীই হউক, তাহার দায়িত্ব ও দণ্ডের কোনই তারতম্য হইতে পারে না। ইহাই অন্য-বিবেচনা-

নিরপেক্ষ শাশ্বত নীতি। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যদি ভ্রমর গোবিন্দলালের প্রতি অভিমান করিয়া থাকে, তাহাতে উচ্চ আদর্শই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রেমের মর্য্যাদা অণুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বিষয়টি আরও একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাউক।

অপরিমিত ভোগতৃষ্ণা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এমন এক সময় ছিল, যখন সে ইহার পরিতৃপ্তির জন্য বন্য পশুর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইত। একের ভোগে অন্যকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা বুঝায়, অতএব ভোক্তার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হওয়া অন্যের পক্ষে স্বাভাবিক। এখন সমাজ বা শাস্তির ভয়ে আমরা হিংসা-প্রবৃত্তি দমন করিতে বাধ্য হই, কিন্তু যখন মানব সমাজ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই, তখন শক্তিই ছিল সর্ব্বার্থসাধিকা। যে শক্তিশালী সে দুর্ব্বলকে বঞ্চিত করিয়া ভোগ্য-বস্তু যথাসম্ভব নিজের আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিত। ইহার ফলে পরস্পরের দ্বন্দ্বে মানবজীবন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই অরাজকতাপূর্ণ অবস্থার অবসানকল্পে পরস্পরের সম্মতিতে ধীরে

ধীরে মনুষ্য-সমাজ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। যখন প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় অবাধ বিলাস-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের সাহচর্য্যে শান্তিময় জীবন যাপন করিতে উৎসুক হইয়া পড়িল, তখনই পতিপত্নীকে লইয়া পরিবার, প্রতিবেশীকে লইয়া সমাজ, এবং দেশবাসীকে লইয়া এক-একটি জাতি ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি, সে পুরুষই হউক, কি স্ত্রীলোকই হউক, সর্ব্বত্রই যে সমব্যবহারের দাবী করিতে পারে, ইহাই শাশ্বত নীতি (Plato's *Republic*)। তারপর দেশ-ভেদে সমাজ বিভিন্ন আদর্শে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহারই ফলে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ প্রভৃতির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু ইহাদের সকলের কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে যে শাশ্বত সমাজ-নীতি, বাহিরের আবর্জ্জনা ভেদ করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। এই আদর্শ অনুসরণ করিয়াই বঙ্কিম ভ্রমরকে দিয়া লিখাইয়াছেন—"যতদিন তুমি ভক্তিযোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস।" এখানে গ্রন্থকার

কল্পনার চরম লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন। ইহাতে হিন্দুসমাজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া তর্ক উপস্থিত করা বৃথা। প্রফুল্ল, সূর্য্যমুখী ও শৈবলিনীর চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি হিন্দু-আদর্শের নমুনা ভাল-রূপেই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই বলিয়া যে তিনি সর্ব্বত্রই নিজের কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবেন, এইরূপ দাবী সমর্থনযোগ্য নহে। প্রকৃত পক্ষে সুদক্ষ শিল্পীর ন্যায় কল্পনার দ্বার মুক্ত করিয়া তিনি "ভ্রমর", "কপালকুণ্ডলা" ও "শান্তির" মূর্ত্তি গঠিত করিয়াছেন। পাঠকগণের পক্ষে এই নূতন আলোক অনুসরণ করিয়াই অগ্রসর হওয়া উচিত।

ভ্রমরের অভিমানের ইহা প্রাথমিক অবস্থা। দোলকের প্রথম আবর্ত্তনে ব্যাপ্তির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিকই হইয়া থাকে। রসশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী বলা যাইতে পারে যে, ভ্রমর এখন আর ধীরা নহে, সে অধীরা নায়িকার বিশিষ্টতা-সম্পন্ন হইয়াছে। আর বঙ্কিমের "দাম্পত্য-দণ্ডবিধি-আইনের" ধারায় ইহাকেই বলে স্বামীর প্রতি চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই

ভুল হইয়াছিল। এখন আমরা তাহাদের ভ্রান্তির রাজ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছি।

বন্দরখালি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গোবিন্দলাল দেখিল, ভ্রমর সত্য সত্যই পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। সে লিখিয়াছিল যে, গোবিন্দলালের প্রতি তাহার আর ভক্তি ও বিশ্বাস নাই, এবং তাহার দর্শনেও আর সে সুখী হইবে না। সে যাহা বলিয়াছিল, কার্য্যেও তাহাই করিয়া গেল! ইহাতে গোবিন্দলালের অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরের বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব। মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে,একটু কাঁদাইব।" কিন্তু তাহার নিজের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল—"একবার শূন্য গৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের সঙ্গে কলহ, এ কথা ভাবিয়া কান্না আসিল।" অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, রোহিণীকে জল হইতে উঠাইবার পরেই গোবিন্দলাল একেবারে রোহিণীর রূপে আত্মহারা

হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রন্থমধ্যে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সে বিচলিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, এখনও ভ্রমরের প্রতি গভীর অনুরাগ অণুমাত্রও হ্রাস-প্রাপ্ত হয় নাই। এই সময়ে সে ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে, অভিমান-বশে রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকারও বলিয়াছেন—"অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন।" গোবিন্দলাল এই মারাত্মক ভুল করিয়া বসিয়াছিল। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, উভয়েই ভ্রান্তিবশে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।

তারপর কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পরে ভ্রমর হরিদ্রা-গ্রামে চলিয়া আসিল। গোবিন্দলাল একদা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিল—"ভ্রমর! তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে।" ভ্রমরও প্রত্যুত্তরে বলিল—"আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও!" দুইটি মেঘই বিদ্যুৎভরা,

সমান আবেগে ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। উভয়েই উভয়কে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া বসিয়া ছিল, অথচ প্রকৃত সত্য নির্ণয় করিবার প্রচেষ্টা কাহারও নাই। নিভৃতে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে হয়ত ইহার মীমাংসা হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু গ্রন্থকার অশৌচাবস্থায় ভ্রমরকে হরিদ্রাগ্রামে আনিয়া তাহার সম্ভাবনাও লোপ করিয়া দিয়াছেন। অতএব চিরবাঞ্ছিত যে মিলন, তাহাও এই সুযোগে সংঘটিত হইতে পারিল না।

যথা সময়ে কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। তৎপর তাঁহার উইল সকলের সম্মুখে পঠিত হইল। যদিও উইলের মর্ম্ম সে পূর্ব্বেই অবগত ছিল, তথাপি ভ্রমরের সঙ্গে বুঝাপড়া করিবার জন্য এই সুযোগে উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিল—"উইলের কথা শুনিয়াছ ?"

ভ্রমর—"কি ?"

গো—"তোমার অর্দ্ধাংশ।"

ভ্র—"আমার না তোমার ?"

গো—"এখন আমার তোমার একটু প্রভেদ হইয়াছে। আমার নয়, তোমার।"

ভ্রমর পত্রে যে বিভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল গোবিন্দলাল তাহারই প্রতিধ্বনি করিল মাত্র। ভ্রমরের ঐ পত্র ও পিত্রালয়ে গমনের ফলে গোবিন্দলাল বিচ্ছেদের প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। এখন এই উইল তাহাদের মিলনের পক্ষে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া তাহারই স্থলে ভ্রমরকে উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করা হইয়াছিল। উইলের এই মর্ম্ম অবগত হইয়াই সে স্বেচ্ছায় তাহাতে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছিল। ইহাতে তাহার অবস্থা কি হইয়া দাঁড়াইল, তাহা স্পষ্টভাবেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল। ভ্রমরের সঙ্গে সে সবেমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালেই তাহার পরাজয়ের সূচনা হইয়া গেল। ইহাতে তাহার অভিমান-বহ্নি দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন মনের আবেগে তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থাও সে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিল। তাই সে ভ্রমরকে বলিয়াছিল—"ভ্রমর! তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে। শ্রাদ্ধের

পরে যাহা বলিবার আছে তাহা বলিব, ইহার মধ্যে সে সকল কথার প্রসঙ্গে কোন কাজ নাই।” এখন এই উইল পড়ার সুযোগে সে ভ্রমরকে তাহা বলিতে আসিয়াছে। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিতেছিল—“তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।” ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল। কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল—“তবে কি করিবে?”

গো—“যাহাতে তুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি তাহাই করিব।”

এই পন্থা অবলম্বন করিতেই সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। এই সুযোগে সে তাহা ভ্রমরকে জানাইয়া দিল।

উইলের মর্ম্ম ভ্রমরেরও অজ্ঞাত ছিল না। ইহাতে যে মহা অনিষ্টের সূত্রপাত হইতে পারে তাহা ভ্রমর এবং তাহার পিতা মাধবীনাথ উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই শ্রাদ্ধের সময়ে আসিয়া সে ভ্রমরকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, সম্পত্তি তাহার শ্বশুরের, ইহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী গোবিন্দলাল। অতএব কৃষ্ণকান্তের উইল অসিদ্ধ। ভ্রমর ইহা

গোবিন্দলালের নিকট ব্যক্ত করিল, কিন্তু তাহাতে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল মাত্র। গোবিন্দলাল বলিল যে, তাহার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না, অতএব সে এই যুক্তি গ্রহণ করিতে পারিল না। ভ্রমর দান করিবার কথাও উত্থাপন করিল। শুনিয়া গোবিন্দলাল বলিল—"তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে?" অবশেষে ভ্রমর অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, তখন গোবিন্দলাল রোহিণীর কথাই ভাবিতেছিল। বস্তুতঃ ইহা অস্বাভাবিক হয় নাই, কারণ পুরাতন আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সে নূতন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার স্বরূপ সম্যক্‌রূপে অবগত না হইয়া সে এখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। গোবিন্দলাল কেন, যাহারা এইভাবে নূতনকে বরণ করিয়া লয়, নূতনের মোহজাল ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

ভ্রমর ভাবিল, উইল তাহাদেব মিলনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব সে পিত্রালয়ে গিয়া গোবিন্দলালের নামে দানপত্র

রেজেষ্টারী করিয়া আসিল। ইহাতে মিলনের জন্য তাহার আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দলালের যে মনোভাবের পরিচয় সে পাইয়াছিল, তাহাতে সেই সময়ে তাহার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করা তাহার পক্ষে নিরাপদ ছিল না। ইহাও সে জানিত যে, একবার পিত্রালয়ে গমন করিয়াই সে অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়াছিল। তথাপি প্রধান কণ্টক দূরীভূত করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। ভ্রমর যখন হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া আসিল, তাহার পূর্ব্বেই তাহার শাশুড়ীর কাশী যাত্রার দিন স্থির হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে গোবিন্দলালও যাইতেছে। "ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ সম্মুখে। শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আবার স্বামীও তাঁহাকে রাখিতে চলিলেন—তিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আইসেন।" অতএব শেষ চেষ্টা করিবার জন্য ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল—"কত দিনে আসিবে, বলিয়া যাও।"

গো—"বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা

নাই।" তারপর গোবিন্দলাল বিদায় লইতে গিয়া বলিল—"ভ্রমর, আমি মাকে রাখিতে চলিলাম।"

পুনরায় ভ্রমর চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসিবে না কি?"

গোবিন্দলালের একই কথা—"ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।"

ইহার পরে রেজেষ্টারী-করা দানপত্র গোবিন্দলালের হস্তে প্রদান করিয়া ভ্রমর বলিল—"পড়।"

গোবিন্দলাল পড়িয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তৎপর ভ্রমর কাঁদিল, অনুনয় বিনয় করিল, ধর্ম্মের ভয় দেখাইল, কিন্তু কিছুতেই গোবিন্দলালকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না। তখন ভ্রমর জোড় হাত করিয়া অকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"তবে যাও—পার, আসিও না। বিনা অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর, কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়? দেবতা সাক্ষী—যদি আমি সতী হই, কায়মনো-

বাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। * * * * যদি একথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও, দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী।” এখানে ভ্রমর যাহা বলিয়াছে তাহাই যে এই আখ্যায়িকার স্বাভাবিক পরিণতি তাহা ঘটনা-সমাবেশের দিক্ দিয়া বিচার করিলে সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। গোবিন্দলাল অভিমানবশে রোহিণীকে অবলম্বন করিয়াছিল। ইহা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। তাহা কাটিয়া গেলেই যে, সে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, ইহা এই আখ্যায়িকা যাঁহারা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের বুঝিতে কোনই কষ্ট হইতে পারে না। আর ভ্রমরের প্রীতির আস্বাদন যে একবার লাভ করিয়াছে তাহার পক্ষে রোহিণীর কৃত্রিম প্রণয়ে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভবপর কি? অতএব গোবিন্দলালের প্রাণ যে আবার ভ্রমরের জন্য কাঁদিয়া উঠিবে, ইহার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভ্রমর ইহা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই সে বলিয়াছিল—“আমি যদি সতী হই, তুমি আবার

আসিবে, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে।" অর্থাৎ তাহার সতীত্ব সম্বন্ধে যেমন তাহার কোন সন্দেহ নাই, গোবিন্দলালের প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধেও সে সেই-রূপ কোন সংশয় পোষণ করে না। ইহা প্রত্যক্ষ-দর্শীর দৃঢ়বিশ্বাসের অভিব্যক্তি মাত্র, বক্তব্য বিষয়কে সুস্পষ্ট করিবার জন্য কথার বিশিষ্ট মাত্রারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে গর্ব্বের আভাস না থাকিলে কথাগুলি একেবারেই প্রাণহীন হইয়া পড়িত।

ইহার পরে পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। প্রথম বৎসর ভ্রমর শাশুড়ীকে পত্র লিখিয়া গোবিন্দ-লালের সংবাদ লইতে চেষ্টা করিল। দ্বিতীয় বৎসরে নিশাকরের চক্রান্তে গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিয়া পলাইল। তৃতীয় বৎসরে ভ্রমরের পীড়া সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। তথাপি স্বামীর জন্য তাহার ব্যাকুলতার সীমা নাই। পঞ্চম বৎসরে ভ্রমরের অর্থ-সাহায্যে গোবিন্দলাল বিচারে অব্যা-হতি লাভ করিয়া পুনরায় নিরুদ্দেশ হইল। ষষ্ঠ বৎসরে সে অভাবের তাড়নায় ভ্রমরের করুণা ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছিল। গোবিন্দ-

লালের জীবনে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ঘটনা। যে গোবিন্দলাল অভিমানবশে নিজের অকলঙ্ক চরিত্রেও কালিমা অর্পণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, ভ্রমরের অনুনয়-বিনয় হেলায় উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, দানপত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, স্ত্রীর অর্থে জীবন ধারণ করিবার কল্পনাতেও অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, আজ সেই গোবিন্দলালই মান, অভিমান ও গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিয়া পত্নীর কৃপাপ্রার্থী! ইহার কারণ কি? আপাততঃ দেখা যায়, অভাবের তাড়নায় সে এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু এখানে অর্থাভাব অপেক্ষা মানসিক ঝটিকার প্রভাবই বেশী লক্ষিত হইয়া থাকে। "জ্ঞানগত বুদ্ধি পশুস্বভাবের মূঢ়তায় খর্ব্ব হোলে প্রাণধারণের নানাপ্রকার দৈন্য মানুষকে দুর্ভাগা করে দেয়। বহুদিনের অন্যায়ের ভার নিয়েও ধর্ম্মমন্দিরে যাওয়া চলে, এবং প্রার্থনা-মন্ত্রও মুখে না বাধতে পারে, কিন্তু নিজের অন্তরের মধ্যে দেবতার সম্মুখে যেখানে রিপুর যবনিকা পড়ে' গেছে, সেইখানে প্রবেশ-পথ দুর্গম হইয়া উঠে, অবশেষে অন্ধতার নেপথ্যে বিনাশের আঘাত

লাগতে থাকে, প্রথমে ধীরে ধীরে, অবশেষে অকস্মাৎ দুর্দ্দান্ত বেগে। সংসারে আঘাতের পর আঘাত আসে, ক্ষতির পর ক্ষতি, কিন্তু পরাভব তখনি হয়, যখন আর শান্তিরক্ষা করতে পারা যায় না, কারণ অশান্তিই প্রলয়ের বাহন [১]।" গোবিন্দলাল দীর্ঘকাল এই অশান্তি-অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া এখন ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতিকূল অবস্থার সহিত দ্বন্দ্ব করিতে করিতে যে তাহার সংহত শক্তি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, ইহা তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহার আর্থিক অভাব বাহ্য, ইহা ভ্রমরের করুণার উদ্রেক করিবার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে মাত্র। অন্যভাবে আলোচনা করিলেও ইহার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

জল স্বভাবতঃ শৈত্যগুণ-সম্পন্ন, কিন্তু অগ্নির সংস্পর্শে আসিয়া ইহা তাপিত হয়, আবার তাপের কারণ দূরীভূত হইলেই পুনরায় ইহা স্বাভাবিক

১। ১৩৪৬ সালের ৭ই পৌষের উৎসবে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বাণী।

অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উচ্ছৃঙ্খলতাও গোবিন্দলালের স্থায়িভাব নহে। দেবোপম চরিত্র লইয়াই সে গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সাময়িক উত্তেজনাবশে সে বিকারগ্রস্ত হইয়াছিল। রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতায় যখন তাহার মোহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, তখনই সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিলেও তাহার প্রভাব কখনও গোবিন্দলালের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় নাই। প্রথম ভাগে যখন সে মাতাকে লইয়া কাশী যাইতেছিল, তখনও চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সে ভাবিয়াছিল "যাহা পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না।" আবার "যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দ-লাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনও ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী"। কিছু কালের জন্য রোহিণী-মেঘ আসিয়া তাহা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু যখনই তাহা অপসারিত হইল, তখনই গোবিন্দলালের হৃদয়া-কাশে ভ্রমরের মূর্ত্তি আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "বালিকার অতি সরল যে প্রীতি অকৃত্রিম, উদ্বেলিত,

কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিন রাত্রি ছুটিতেছে, ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন।” এখন সেই পূর্ব্ব স্মৃতি তাহার মনে জাগরিত হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, ভ্রমর তাহার কত আপনার জন। শিশু আঘাত পাইলে মাতার নিকট ছুটিয়া আসে, স্বামী দুঃখের আবর্ত্তে পড়িলে পত্নীর নিকটে সান্ত্বনা প্রার্থনা করে। তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরকে লিখিয়াছিল—“আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয়, সকলই তুমি শুনিয়াছ। আমি এখন নিঃস্ব। পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি ?” গোবিন্দলালের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া না আসিলে সে কখনও ভ্রমরকে এইরূপ পত্র লিখিতে পারিত না। অপরাধ আমরা সকলেই করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার জন্য এমন অকপটে দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার শক্তি আমাদের কয় জনের রহিয়াছে ? যে-শক্তির বলে সে রোহিণীকে হত্যা করিতে পারিয়াছিল, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া এখন তাহাকে আত্মজয়ে নিয়োজিত করিয়াছে। এইভাবে

দুর্ব্বলতাকে জয় করাও অসীম বীরত্বের পরিচায়ক। এখানে গোবিন্দলাল যে পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, তাহাই গ্রন্থকার বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এই পত্র প্রাপ্তির পরেই ভ্রমরকে জীবনের কঠোরতম অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। যে-স্বামী ভিন্ন জীবনে সে আর কিছু জানে নাই, যাহার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া দিনে দিনে পলে পলে সে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছিল, আজ সেই স্বামী ভিক্ষা-পাত্র হস্তে তাহারই দ্বারে করুণাভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইয়াছে! তাহাদের উভয়ের পক্ষেই এখন ইহা অদৃষ্টের পরিহাস মাত্র। গোবিন্দলাল লিখিয়াছিল—"ভ্রমর! ছয় বৎসর পরে এ পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে বোধ হয়, সকলই তুমি শুনিয়াছ। আমি এখন নিঃস্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিরাছি, এখন ভিক্ষা মিলে না, সুতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি। তাই মনে করিয়াছি হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব—নহিলে খাইতে পাই না।

কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী—বাড়ী তোমার—আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি স্থান দিবে কি ?" ইহা ভ্রমরকে এক মহাসমস্যার সম্মুখীন করিয়া দিল। পত্র পড়িয়াই ভ্রমর বুঝিতে পারিল, যে ত্রিবিধ কারণে গোবিন্দলাল তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, এখন সে সকলের অবসান হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ অভিমান, অভিমান থাকিলে সে এইরূপ পত্র লিখিতে পারিত না। দ্বিতীয়তঃ রূপের মোহ, রোহিণীর হত্যাতেই ইহার স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি। তৃতীয়তঃ উইল—এই পত্র পড়িলেই বুঝা যায় যে,ইহা লইয়া আর দ্বন্দ্ব করিবার প্রবৃত্তি গোবিন্দলালের ছিল না, অর্থাৎ কৃষ্ণকান্তের ব্যবস্থাও সে অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। অতএব তাহার পক্ষে এখন মিলনের সকল বাধা তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভ্রমরের পক্ষে কি ? তাহার অভি-যোগের ত কোনই প্রতীকার হয় নাই, অধিকন্তু গ্রন্থকার কৌশলে মিলনের পক্ষে আর এক অলঙ্ঘ্যনীয় বাধার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। গোবিন্দ-লাল যে নারীহত্যাকারী ইহা ভ্রমর ভুলিতে পারে

নাই। অতএব স্বামীর পত্র পাইয়া সে বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রন্থকার শুধু ভ্রমরকে নহে, আমাদিগকেও উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে এই স্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জটিলতাপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এখন ভ্রমর করিবে কি? মিলনের মোহে অভিভূত হইয়া নিজের বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিবে, না স্বীয় আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আত্মাহুতির পথে অগ্রসর হইবে? এই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরাও চিন্তা করিতেছি, গ্রন্থ মিলনাত্মক হইবে, না শোচনীয় পরিণতিতে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে? ভ্রমরের সিদ্ধান্তের উপর ইহা সম্পূর্ণ ই নির্ভর করিতেছিল।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—এক বিনিদ্র রজনী চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া,সহস্র সহস্রবার ভাবিয়া ভ্রমর পত্রের উত্তর স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রভাতে সে স্থির—বিকারশূন্য। গোবিন্দলাল লিখিয়াছিল— "তুমি বিষয়াধিকারিণী —বাড়ী তোমার—আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি স্থান দিবে কি?" ভ্রমর লিখিল যে, বিষয় গোবিন্দলালের, তাহার হইলেও সে ইহা দান

করিয়াছে। অতএব নির্ব্বিঘ্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া সে ইহা ভোগদখল করিতে পারে। কিন্তু "আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট—আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।" পত্র পড়িয়া গোবিন্দলাল ভাবিল —"কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই!" কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ভ্রমর জয়যুক্ত হইয়াছে। অনেকে তাহার এই কঠোরতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাতেই যে কবি কল্পনাবলে এক মহাসত্যের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, এখন আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

রমণী স্বভাবতঃ ক্ষমাশীলা ও স্নেহময়ী। এই সকল তাহার আংশিক বিশেষত্ব মাত্র, যাহার সাহায্যে সে জগতের প্রস্ফুটিত হইবার বাসনাকে চরিতার্থতা দান করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতি কুসুমের ন্যায় কোমল হইলেও বজ্রের ন্যায় কঠোর। এক হস্তে স্নেহ বর্ষণ করিয়া সে মাটির বুকে

গোলাপ প্রস্ফুটিত করে দেয়, আবার কাল পূর্ণ হইলে অপর হস্তের নির্ম্মম আঘাতে তাহাকেই ধূলিকণায় পর্য্যবসিত করিয়া দেয়, জগতে প্রতিনিয়ত এই ভাবে সৃজন-প্রলয়ের যে লীলাখেলা চলিতেছে, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া আমরা তাহাতে বিচলিত হইয়া পড়ি, কিন্তু বিরাট সমগ্রতার ধারণা লইয়া বিচার করিলে ইহাতেই বিশ্বের শ্রেয়োরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এই নির্ম্মমতাই পুরাতনকে নূতনে পরিণত করিয়া নবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। অতএব প্রকৃতির "এই সৃষ্টি-বিকাশী গতি সমগ্রের বিরুদ্ধে কোথাও উদ্দাম নয়, বৃহৎ শান্তিতেই তার আত্মসৃষ্টি, তার কর্ম্মশক্তির ধ্রুব প্রতিষ্ঠা।"[১]

ভ্রমর ইহার সন্ধান পাইয়াছিল বলিয়াই "অকাতরে এবং আনন্দে আপনার সমস্ত কিছুকে উৎসর্গ করে সাধারণ জীবধর্ম্মের কার্পণ্য থেকে অমরাবতীতে" উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিল। মানব-

১। ১৩৪৬ সালের ৭ই পৌষে উৎসবে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বাণী হইতে উদ্ধৃত, এবং পরেও।

মহিমায় তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই মনুষ্যত্বকে সে শ্রদ্ধার যোগ্য করিয়া দেখিতে পারিয়াছে।

"মানুষ বিধাতার অসমাপ্ত সৃষ্টি। সেই সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করিবার ভার মানুষের নিজের হাতে। মানুষের মহত্ত্ব তার আপনার গড়া, মানব-বিশ্বের সে স্রষ্টা, সে বিধাতা। যেমন শরীরে তেমনি সমাজে আত্মরক্ষার একটা সাধনা আছে। সেই আত্মরক্ষাই মনুষ্যত্ব রক্ষা, তার সতর্ক উপায় মানুষের নিজেরই মধ্যে।" গোবিন্দলাল এই মনুষ্যত্বকে অপমানিত করিয়া বিশ্বের কল্যাণ-শক্তিকেই অপমানিত করিয়াছিল। এখন সে আসিয়া আবার কৃপাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কিন্তু "পশুস্বভাবে কর্ত্তব্যবুদ্ধির বিকার ঘটালে মানবসমাজকে আঘাত ক'রে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বনাশ সাধন করে। যাহারা জীবনে এইরূপ ভুল করে বসে, নিজের জবানীর ওকালতীতে তারা যে নিষ্কৃতি পাবে সে সম্ভাবনা নেই, কেন না, এ বিচারশালায় দরখাস্তের নৈপুণ্যে দয়া জাগবে না, প্রশ্রয় নাম্‌বে না।" গোবিন্দলালও নিজের

অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভ্রমরের সম্মুখীন হইতে সাহসী হয় নাই, সুদূর প্রবাস হইতেই পত্র লিখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার কাতর প্রার্থনা ভ্রমরকে বিচলিত করিতে পারে নাই। গ্রন্থকার কল্যাণ-স্বরূপ বিধাতার ন্যায়ের অমোঘ-দণ্ড ভ্রমরের হস্তে প্রদান করিয়া বলহীন যে ক্ষমার অযোগ্য তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহাই ভ্রমরের কঠোরতার প্রকৃত মর্ম্ম।

ইহার অল্পকাল পরেই ভ্রমরের অভিনয়ের যবনিকাপাত হইল। যে আশায় সে এতদিন দুর্ব্বিষহ জীবন-ভার বহন করিয়া আসিতেছিল, গোবিন্দলালের আবির্ভাবে তাহা চরিতার্থতা লাভ করিয়া নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। যক্ষের ধনের ন্যায় সে যত্নের সহিত গোবিন্দলালের সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এখন গোবিন্দলালের পত্রে সে বুঝিতে পারিল যে, প্রয়োজন হইলে সে ইহার ভার গ্রহণ করিতে আর অনিচ্ছুক হইবে না। যে দারুণ উৎকণ্ঠা হৃদয়ে পোষণ ধরিয়া সে জীবন ধারণের প্রেরণা লাভ করিয়াছিল, গোবিন্দলালের আবির্ভাবে তাহার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অবসাদ

আসিয়া তাহার জীবনীশক্তিকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। অতএব গ্রন্থকার তাহাকে রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসারিত করিয়া দিয়াছেন। যত উচ্চ-গ্রামে অধিষ্ঠিত হইয়াই সে গোবিন্দলালকে প্রত্যা-খ্যান করিয়া থাকুক না কেন, যখন তাহার বিশ্রান্ত জীবন-বীণায় অবসানের পূরবী-রাগিণী ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তখন হৃদয়-নিহিত নিষ্পিষ্ট বাসনার দ্বার আর সে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। তাই কাতরভাবে যামিনীর নিকট বলিয়াছিল—"দিদি, একটি বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেই দিন যোড়-হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, একদিন যেন তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম—'আমি যদি সতী হই, তবে আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।' কই, আর ত দেখা হইল না। আজি-কার দিন—মরিবার দিনে, দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম, একদিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম।" গ্রন্থকার এইরূপে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন সংসাধিত করিয়াছেন। ইহাকেই

ইংরাজিতে বলে "True to the kindred points of heaven and home."[২]

তারপর গোবিন্দলাল যখন নিকটে আসিয়া বসিল,—"তখন ভ্রমর আপনার করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল—'আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই!'" ভ্রমর এখন সংসারের হিসাব-নিকাশ মিটাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছে। এই সময়ে গোবিন্দলালের পদরেণু গ্রহণ করিয়া সে বুঝাইয়া দিল যে, বাহ্যিক কঠোরতা সত্ত্বেও স্বামীর প্রতি তাহার ভক্তি অবিচলিতই ছিল। আর অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে নিজের দেনাও পরিশোধ করিয়া গেল। জন্মান্তরের সুখের কামনা অতীতের স্মৃতিরই প্রতিক্রিয়া মাত্র। ইহাতে হিন্দু সমাজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবার কোনই কারণ নাই (হারাণ রক্ষিত মহাশয়ের "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম"

২। এই বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

দ্রষ্টব্য)। ভ্রমরের জন্মান্তরের সুখের কল্পনায় যে গোবিন্দলালও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, তাহা টিপ্পনীসহ প্রদর্শন করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াও মনে হয় না। যাহার জন্য সে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখের পরিকল্পনা তাহার পক্ষে অসম্ভব। ভ্রমর মৃত্যুতেই অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিল।

ট্রাজিডি

এ দেশে বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা লইয়া গ্রন্থ-রচনার বিধি নাই বলিয়া অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে পরবর্ত্তীকালে বিষাদান্তক গ্রন্থ-রচনার যে প্রেরণা এদেশবাসী লাভ করিয়াছিল, বঙ্কিম তাহারই প্রভাবে ট্রাজিডি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। যে দেশে এবং যে সমাজেই মানুষ বাস করুক না কেন, দুঃখের স্পর্শ হইতে তাহার মুক্তি পাইবার উপায় নাই, কারণ মানব-জীবন সুখ ও দুঃখের সমবায়েই গঠিত হইয়াছে। আবার পর্য্যালোচনা করিলে ইহাও দেখা যায় যে, জীবনে সুখ অপেক্ষা দুঃখের পরিমাণই বেশী, এবং সুখের তুলনায় দুঃখই আমাদের হৃদয়ে অধিকতর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির, দেশ বা জাতির ইতিহাসের অধিকাংশই দুঃখের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। অতএব দুঃখের সহিত আমরা এমন ভাবে পরিচিত

আছি বলিয়াই দুঃখ দেখিলেই আমাদের মনে সহানুভূতির উদ্রেক হয়। এই জন্য সকল দেশেই কবিরা দুঃখের কাহিনী লইয়া গ্রন্থ-রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইলিয়ডের ন্যায় এদেশে রামায়ণ মহাভারতও রচিত হইয়াছিল। এই দুই গ্রন্থই বিষাদাত্মক। অতএব ট্রাজিডি রচনায় বঙ্কিমের প্রাচ্য আদর্শের অভাব হয় নাই।

কিন্তু ট্রাজিডির প্রকৃত স্বরূপ কি? এক কথায় বলিতে গেলে ইহা হতভাগাদের ইতিহাস। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদের মনে যে সহানুভূতির উদ্রেক হয়, তাহাতেই ইহার সার্থকতা। ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা যতই বিষাদময় হউক না কেন, তাহাতে যদি আমাদের মনে সমবেদনার তরঙ্গ উত্থিত না হয়, তাহা হইলে ট্রাজিডির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব চরিত্রগুলির দুঃখময় পরিণতির সমতানে আমাদের হৃদয়-তন্ত্রী ধ্বনিত হওয়া ট্রাজিডির পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী গ্রহণ করিতেছি। রামের বনবাসে এবং সীতার নির্ব্বাসনে আমরা যতটা

ব্যথিত হই, রাবণ-বধে ততটা হই না। আবার পাণ্ডবগণের দুঃখে যতটা অভিভূত হই, দুর্য্যোধনের নিধনে ততটা হই না। ইহার কারণ কি? আমাদের মনে ভাল ও মন্দের ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে সৎ ও অসতের তারতম্য সহজেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই জন্য দুষ্কৃতকারীর চরম পরিণতিতেও আমাদের হৃদয় শোকের আবর্ত্তে নিমজ্জিত হয় না, কিন্তু সতের দুর্দ্দশায় আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়ি। আবার নির্দ্দোষ যদি অন্যের ষড়যন্ত্রে দুঃখভোগ করে তাহা হইলেই আমাদের হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠে। রাবণ ও দুর্য্যোধন তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছিল, কিন্তু রাম, সীতা ও পাণ্ডবগণ নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। এইজন্যই তাহাদের দুঃখে আমাদের সহানুভূতির তারতম্য লক্ষিত হয়। কৃষ্ণকান্তের উইলেও গ্রন্থকার ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। রোহিণী যখন বারুণী পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছিল তখন গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"রোহিণীর অনেক দোষ—তাহার কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি?

করে না।” কিন্তু গোবিন্দলালের অধঃপতন লক্ষ্য করিয়া তিনিই বলিয়াছেন—“আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।” সহানুভূতির এই তারতম্যই উভয় চরিত্রের বিশিষ্টতা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ দুঃখের ত্রিবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, এবং আধ্যাত্মিক। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি ট্রাজিডি রচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। বজ্রাঘাতে বা সর্পদংশনে মৃত্যু হইল, এইরূপ ঘটনা লইয়া ট্রাজিডি রচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে কিনা সময় বিশেষে এই জাতীয় ঘটনা দ্বারা প্রধান চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার সাহায্য হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দুঃখের বীজ আমাদের হৃদয়-মধ্যেই নিহিত থাকে। বাস্তব জীবনে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, মানুষ স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরে। তাহারই অনুকরণে দুঃখের ইতিহাস রচিত হয়। ইহাতে আমরা নিজের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিয়া যেন সতর্ক হইতে পারি ইহাই ট্রাজিডি রচনার উদ্দেশ্য। কাম, ক্রোধ,

লোভ, মোহাদি রিপু, এবং ভয়, ভীতি, মান, অভিমান, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি মনোবৃত্তির তাড়নায় আমরা সতত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করিতেছি। ইহাদের কোন একটি অতিমাত্রায় আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেই ভ্রান্তি উৎপাদিত হয়। তাহার বশে চালিত হইয়া লোক ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইয়া থাকে। অভিনেতারা তাহাদের দোষ বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু দ্রষ্টার নিকটে ইহা সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। মানবের দুঃখের ইতিহাসের ইহাই মূল তত্ত্ব। গ্রন্থ মধ্যে এই সকল ভুলভ্রান্তির সুষ্ঠু সমাবেশ দ্বারা গ্রন্থকার দর্শক ও পাঠকগণকে সচকিত ও উৎকণ্ঠিত করিয়া ঘটনা-স্রোতের সহিত চালিত করেন, অবশেষে বিষাদময় পরিণতিতে আনিয়া তাহাদিগকে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলেন। ইহাই ট্রাজিডি রচনার শিল্প-চাতুর্য্য।

সাধারণতঃ ট্রাজিডিতে ক্রমবিন্যস্ত তিনটি স্তরের সংস্থান দৃষ্ট হয়—১। উপক্রম, ২। সংঘাত ৩। প্রতিক্রিয়া এবং পরিণতি।' উপক্রম-ভাগে প্রধান চরিত্রগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে, সংঘাত

আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত ইহার পরিস্থিতি। দৈহিক সৌন্দর্য্য, সামাজিক বা আর্থিক অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনায় অভিনেতাগণকে পাঠকের সহিত পরিচিত করিয়া দেয় বটে, কিন্তু ইহা বাহ্য। বাহ্য হইলেও ইহা উদ্দেশ্যমূলক। কে কিরূপ ভূমিকায় অভিনয় করিবে তাহা কল্পনালোকে প্রত্যক্ষ করিয়া গ্রন্থকার পাত্রপাত্রীতে রূপাদির সংস্থান করেন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে অন্তর্জগতের বিশেষত্ব প্রদর্শনেই তাহাদের প্রকৃত পরিচয় বিজ্ঞাপিত হয়।

প্রাচীনকালে দেবদেবী, রাজা মহারাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণকে লইয়া আখ্যায়িকা রচিত হইত। ইলিয়ড এবং রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি এই জাতীয় গ্রন্থ। মহাকবি সেক্ষপীয়রও তাঁহার প্রধান প্রধান ট্রাজিডিগুলিতে এই রীতিই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। লীয়র, হ্যামলেট এবং ম্যাকবেথে রাজা মহারাজার উপাখ্যানই লিখিত হইয়াছে। আর ওথেলোও ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। এইভাবে আখ্যায়িকা মনোনীত করিবার পশ্চাতে এক গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। বড় ঘরের কথা হইলেই লোকে আগ্রহ করিয়া শুনে, অতএব অনুষ্ঠানেই

এই জাতীয় আখ্যায়িকার প্রতি লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আবার সমাজে যাঁহারা উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন, সাধারণতঃ আশা করা যায়, কৃষ্টিতেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ-স্থানীয়, এবং সংঘাতও তাঁহাদের জীবনে জটিলতর। অতএব সূচনাতেই গ্রন্থকার পরিবেশনের আভাস দিয়া পাঠকদিগকে প্রলোভিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। গ্রন্থ-রচনার এই রীতি এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, তথাপি প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিকে এখনও কোন না কোন অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব-সমন্বিত করিয়াই চিত্রিত করা হয়, নতুবা লোকের চিত্ত তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না। অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের যে সকল বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করা হইত, এখন তাহাই আংশিকভাবে সাধারণ লোকের উপর আরোপিত হইয়া থাকে। অতএব যে রীতিতেই আখ্যায়িকা রচিত হউক না কেন, পরিণতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাত্র-পাত্রীর রূপগুণাদির বর্ণনা সকল শ্রেণীর গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ট্রাজিডি রচনার পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ট্রাজিডি—বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা। সাধারণতঃ প্রধান কোন চরিত্রের মৃত্যুতেই ইহার পরিসমাপ্তি হয় (কপালকুণ্ডলা, ওথেলো প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), কিন্তু কেবল মৃত্যুসংঘটিত হইলেই সকল সময়ে আমাদের সমবেদনার উদ্রেক হয় না। নায়ক নায়িকা প্রভৃতগুণসম্পন্ন, ভোগে সুখে গভীর শান্তিতে বাস করিতেছে, পরিশেষে কোন প্রকার ভুলভ্রান্তির জন্য, অথবা অন্যের ষড়যন্ত্রে তাহারা দুঃখের সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, অথবা দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইল (সীতারাম দ্রষ্টব্য), এইরূপ আখ্যায়িকাই আমাদের হৃদয়ে গভীর ব্যথার তরঙ্গ সমুত্থিত করে। কোন্ উচ্চগ্রাম হইতে কোথায় পতন হইয়াছে, এই ধারণা না জন্মিলে দুঃখে ও সমবেদনায় হৃদয় ভরিয়া উঠে না। অতএব গ্রন্থের উপক্রমভাগে প্রধান চরিত্রগুলির দোষগুণাদির পরিচয় প্রদান করিবার পরে সংঘাতের সূচনা করিয়া গ্রন্থকার পাঠকগণকে উৎকণ্ঠিত করিবার সুযোগ গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়তঃ সংঘাত। ইহা ট্রাজিডির সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। সংঘাত দ্বিবিধ—বাহ্য ও মানসিক।

প্রথমতঃ বাহিরের ঘটনা হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়া মনোবৃত্তির উপরে প্রভাব বিস্তার করে। পরে ধীরে ধীরে অন্তর্বিপ্লব সূচিত হয়, এবং তাহার ফলে সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্বে সুমতির পরাজয় সাধিত হইলেই ধ্বংসের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়। বিবিধ প্রতিকূল ঘটনার সমাবেশ দ্বারা এই অন্তর্বিপ্লবের জটিলতা প্রদর্শন করার উপরেই ট্রাজিডির সফলতা নির্ভর করে। ঘটনার পর ঘটনা, ছায়াচিত্রের দৃশ্যের ন্যায়, ঘটিয়া যাইতেছে, আর তাহার আবর্ত্তে পড়িয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা পাঠকের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে, এবং অভিনেতাদিগের মানসিক বিরোধের ঘাতপ্রতিঘাতের সমতালে পাঠকের মনেও তরঙ্গ উত্থিত হয়। ইহাতেই হয় প্রকৃত রসসৃষ্টি। অবশেষে বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কেহ হয়ত ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, কেহ বা আবেগের বশীভূত হইয়া কোন ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হন। গ্রন্থের পরবর্ত্তী অংশে ইহারই পরিণতি বর্ণিত হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি। ইহাই

প্রকৃতপক্ষে ট্রাজিডির সঙ্কটকাল (অর্থাৎ crisis period)। এই সময়ে মনোবলের অভাবে যদি অভিনেতা আর অগ্রসর হইতে না পারে, তাহা হইলে ট্রাজিডি হয় না, গ্রন্থের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সূর্য্যমুখী প্রভৃত আবেগের সহিতই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিবিধ প্রতিকূল ঘটনার সম্মুখীন হইয়া সে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এদিকে নগেন্দ্রও তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সূর্য্যমুখীর প্রত্যাবর্ত্তনে স্বামী-স্ত্রীর মিলনে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। অতএব ট্রাজিডি রচনায় পাত্র পাত্রীর মধ্যে কাহারও হৃদয়ে ট্রাজিক বিশেষত্ব ফুটাইয়া রাখিতে হয়। আক্রান্ত হইয়া রাবণ যদি সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া রামের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিত, তাহা হইলে লঙ্কাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইত না। পাণ্ডবগণের প্রার্থনানুযায়ী দুর্য্যোধন পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিলেও কুরুক্ষেত্রের লোকক্ষয়কর যুদ্ধ নিবারিত হইত। প্রতাপ নামে-মাত্র বশ্যতা স্বীকার করিলেই অশেষ দুর্গতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই

ইহাতে স্বীকৃত হন নাই! বাস্তব জীবনের এই সকল ঘটনার ছায়া অবলম্বনে ট্রাজিক চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। আবেগের বশীভূত হইয়া ইহারা যাহা অনুষ্ঠিত করে, তাহার প্রতিক্রিয়ার সময়েই প্রকৃত শক্তিপরীক্ষা হইয়া যায়। যে আপন বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া ইহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে, সে-ই বীর, নতুবা আত্মবিস্মৃতিতে দুর্ব্বলতারই পরিচয় প্রদান করা হয়। শোচনীয় পরিণতিতে উপস্থিত হইতে হইলেও শক্তির প্রয়োজন। এইজন্য প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, অনেক অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। ভাল, কি মন্দ যে ভূমিকাতেই অভিনয় করা যাউক না কেন, সর্ব্বত্রই একই নিয়ম—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। [১]

ট্রাজিডির আর একটি বিশেষত্ব সম্বন্ধেও এখানে আলোচনা করা যাইতেছে। চন্দ্রকে সুধার আধার কল্পনা করিয়া আকাঙ্ক্ষার প্রতীক রাহু যখন

১। Bradley's Shakespearean Tragedy হইতে সঙ্কলিত।

তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য ধাবিত হয়, আর চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া যদি সে দেখিতে পায় যে, যাহাকে সে এত লোভনীয় বস্তু বলিয়া মনে করিয়াছিল তাহা প্রকৃতপক্ষে পাহাড়-পর্ব্বত-পূর্ণ এক অদ্ভুত পদার্থ মাত্র, তখন অবশ্যই অতৃপ্তিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠে, এবং সে বুঝিতে পারে যে, তাহার সারা জীবনের সাধনাই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে যদি সে

"কপালে হানিয়া কর বসে' পড়ে ভূমিপর
নিজেরে করিতে চাহে নির্দ্দয় লাঞ্ছনা"

তাহা হইলে তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতির আবেগে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে না কি? রামায়ণ ও মহাভারতে এইরূপই ঘটিয়াছিল বলিয়া ইহাদিগকে ট্রাজিডির পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। রামচন্দ্র দুঃসাধ্য কার্য্য করিয়া সীতার উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু অযোধ্যায় আসিয়া পুনরায় তাঁহাকে নির্ব্বাসনে প্রেরণ করিতে হইল। পরে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে যাইয়া দেখিলেন, সীতা ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইয়া তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহাকে শ্মশানের উপরেই রাজত্ব করিতে হইবে। এইরূপ ব্যর্থতার বিষাদে কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হইয়া যখন অভিনেতার মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস উত্থিত হয়, তখন তাহারই তরঙ্গের আঘাতে আমাদের হৃদয়ও অভিভূত হইয়া পড়ে, এবং আমরা অচিন্তনীয় নিষ্ঠুর ভবিতব্যতার কঠোর পরিহাসের বিষয় কল্পনা করিয়া সচেতন হইবার অবসর প্রাপ্ত হই। ইহাই ট্রাজিডির অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়।

ট্রাজিডির কয়েকটি প্রধান প্রধান বিশেষত্ব সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হইল। এখন দেখিতে হইবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনায় বঙ্কিমের লেখনী কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি এই গ্রন্থে কোন অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ করেন নাই, এবং দৈবানুগ্রহেও কিছু সংঘটিত হয় নাই। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে দুইটি মাত্র এই জাতীয় ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। গোবিন্দলাল যখন রোহিণীকে পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময়ে "ভ্রমর একটা লাঠি লইয়া

একটা বিড়াল মারিতেছিল। বিড়াল মারিতে লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।" আবার নিশাকর যখন প্রসাদপুরের কুঠিতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন "অকস্মাৎ রোহিণীর তবলা বেস্থরা বলিল। ওস্তাদজীর তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল, গীত বন্ধ হইল, গোবিন্দলালের হাতের নভেল পড়িয়া গেল।" কিন্তু 'ম্যাক্‌বেথে' ডাইনীদিগের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায়, এবং 'হ্যাম্‌লেটের' ভূতের নিকট পিতৃহত্যার বিষয় অবগত হওয়ার ন্যায়, অথবা কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শনের ন্যায় ইহা পরবর্ত্তী আখ্যায়িকার উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এমন কি, অভিনেতারা কেহই ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া সতর্কতা অবলম্বন করে নাই। অতএব এই বর্ণনা দ্বারা গ্রন্থকার কেবল মাত্র পাঠকগণকেই ভবিষ্যতের আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন, ইহার আর কোনই সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ এই গ্রন্থের পাত্রপাত্রীগণ 'সকলেই সাধারণ মনুষ্য মাত্র, আমাদের ন্যায়ই তাহারা দোষগুণের সমবায়ে গঠিত

হইয়া অভিনয় করিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রধান চরিত্রগুলির প্রত্যেককেই গ্রন্থকার কোন না কোন প্রকার বিশিষ্টতাসম্পন্ন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। একজন সমালোচক লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণকান্তের উইলের আখ্যানবস্তুতে কোনও অসাধারণ, অলৌকিক বা অতিরিক্ত মাত্রায় কাল্পনিক ঘটনার সমাবেশ নাই। উহার কোনও চরিত্রে অসাধারণ গুণগ্রামের বা অসাধারণ দোষরাশির সমাবেশ করা হয় নাই, তথাপি পূর্ব্বাপর সর্ব্বত্র সমুন্নত হৃদ্যতা, পরিমাণ-সামঞ্জস্য, ভাবব্যঞ্জকতা, রসোদ্বোধকতা প্রভৃতি গুণের সদ্ভাবে উহা অপূর্ব্বরূপে চমৎকার-জনক হইয়াছে" (অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয়ের "বঙ্কিমচন্দ্র", ২৮৩ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বঙ্কিম অতি সাধারণভাবেই আখ্যায়িকার ভিত্তি গঠিত করিয়া লইয়াছেন। কৃষ্ণকান্তের উইলের সারমর্ম্ম এই ভাবে সঙ্কলিত করিয়া লইতে পারা যায়—আদম ও ইভ পরম শান্তিতে স্বর্গরাজ্যে বাস করিতেছিল, অবশেষে শয়তানের প্ররোচনায় তাহারা স্বর্গচ্যুত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ইহারই অনুরূপ আখ্যায়িকা প্রকারান্তরে এই

গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতেও সংঘাত আসিয়াছে বাহিরের আবর্ত্ত হইতে এবং তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা বর্দ্ধিত করিয়া গ্রন্থকার আখ্যায়িকাকে শোচনীয় পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যাবতীয় দুর্দ্দশার অন্তরালে আমরা মানসিক দুর্ব্বলতারই আভাস প্রাপ্ত হই। রোহিণী প্রবৃত্তিবশে নিজের ও পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, আর গোবিন্দলাল ও ভ্রমর অভিমানের উত্তেজনায় বিচ্ছেদের প্রেরণা লাভ করিয়াছে। কিন্তু উক্ত তিনটি চরিত্র বিশ্লেষিত করিয়া অনেকে বঙ্কিমের শিল্প-চাতুর্য্যের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই জাতীয় অভিযোগ কাল্পনিক কিনা, তাহার আলোচনাতেই প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থকারের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া এখন আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

কৃষ্ণকান্তের উইলে প্রধান চরিত্র দুইটি—গোবিন্দলাল ও ভ্রমর। দুর্ভাগ্যবশতঃ অস্থিরমতি রোহিণী আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। উক্ত তিনজনের মধ্যে রোহিণীই সর্ব্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছিল, অতএব তাহার সম্বন্ধেই প্রথমে

আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। রোহিণীর চরিত্রে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই কল্পনা করিয়া বঙ্কিমের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে।[১] অভিযোগটী অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া ইহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়-রূপে গ্রহণ করা যাইতেছে।[২] প্রথমতঃ দেখিতে হইবে কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী কিরূপ ভূমিকায় অভিনয় করিয়া গিয়াছে। গ্রন্থ মধ্যে সে প্রতিনায়িকা মাত্র, ট্রাজিডি-সংঘটন-কারিণী। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইলে তাহাকে যে ভাবে চিত্রিত করিলে গ্রন্থের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বঙ্কিম যে সেইভাবেই তাহার চরিত্রে রেখাপাত করিয়াছেন, ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

গ্রন্থের উপক্রমভাগে রোহিণীর মাতাপিতার

১। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ 'স্বদেশ ও সাহিত্য' (৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" নামক গ্রন্থের ১৮২—১৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত সুবোধ সেনগুপ্তও তাহার "বঙ্কিমচন্দ্রে" (১৭৩-১৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

পরিচয় গ্রন্থকার দেন নাই। আমরা ইহাই মাত্র জানিতে পারি যে, সে ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতৃ-কন্যা, এবং “তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাড়ীতে থাকিত!” কিন্তু গ্রন্থকার তাহার রূপ ও গুণের পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। “রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলেও হয়। ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দাল্না ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলিপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত, চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন।” ইহা অভ্যস্ত কৌশলমাত্র, আর এই-জাতীয় দক্ষতা যখন সে নিজের উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে অস্ত্ররূপে গ্রন্থমধ্যে কখনও প্রয়োগ করে নাই, তখন বলা যাইতে পারে যে, উক্ত প্রকার বর্ণনায় রোহিণীর অদ্ভুত চাতুর্য্যেরই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা উইল চুরির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তারপর বিধবা রোহিণীর শরীরে অতুলনীয় রূপযৌবনের সমাবেশ করা হইয়াছে। ইহাও যে গ্রন্থকারের পক্ষে

উদ্দেশ্যমূলক তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। রূপ-যৌবন দ্বারা গোবিন্দলালকে প্রলোভিত করিয়া সে গ্রন্থমধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে, আর তাহার বৈধব্যের কল্পনা করিয়া গ্রন্থকার তাহার অভাবের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন —ভোগে সে বঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল অভাবই লোককে বিপথগামী করিতে পারে না, যদি না মনোবলের অভাবে তাহার সংযম-শক্তি শিথিল হইয়া পড়ে। অতএব সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থকার তাহার মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া রোহিণীর অন্তরের পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন। "বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল," ইহাতেই তাহার দুর্ব্বলতার আভাস প্রদান করা হইয়াছে। রোহিণীর মূর্ত্তি গঠিত করিবার জন্য কবি এই সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন।

তারপর উইল পরিবর্ত্তিত করিতে আসিয়া যখন হরলাল বিধবা বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিল তখন কাটিয়া ফেলিলেও রোহিণী যাহা করিতে পারিবে না বলিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল, বিবাহের প্রলোভনে অতি সহজেই তাহা করিতে স্বীকৃত

হইয়া গেল। এখানেই তাহার শোচনীয় বিশেষত্বের প্রথম উন্মেষ। ইহার দ্বারা গ্রন্থকার বুঝাইয়া দিলেন যে, ভোগের লালসা গুপ্তভাবেই তাহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিল, এবং তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা নাই,—অতএব সহজেই সে সঙ্কল্প-চ্যুত হইয়া পড়ে। এখানেই রোহিণীর চরিত্র রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মানন্দের অন্তঃপুর হইতে সে বিস্তীর্ণ পৃথিবীটার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল—তাহার মনে হইয়াছিল ভোগই সর্ব্বসুখের আস্পদ। অতএব অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থের জন্য সে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় হইতে পরবর্ত্তী আখ্যায়িকায় রোহিণীর এই বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াই বঙ্কিম গ্রন্থ-রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ যে কামনা তাহার মনে জাগরিত হইয়াছিল, সে সেই কামনার মূর্ত্তি ধরিয়াই অভিনয় করিয়া গিয়াছে। হরলালের নিকট প্রত্যাখ্যাতা হইয়াও সে কামনার আবেগ রোধ করিতে পারে নাই, গোবিন্দলালের উপদেশেও তাহার চৈতন্য সম্পাদিত হয় নাই, মিথ্যা অপবাদেও সে দমিয়া যায় নাই। এইরূপে সংযম

7—O. P. 64

অবলম্বন করিবার বহু সুযোগ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সে অসংযমের পথেই চলিয়াছিল। কামনা যেন তাহাকে রজ্জুবদ্ধ পশুর ন্যায় আকর্ষণ করিয়া এক আশ্রয় হইতে অপর আশ্রয়ে পরিচালিত করিয়াছে। এইরূপ চরিত্র সাধারণতঃ দুর্ব্বলতার আধারই হইয়া থাকে। ইহারই ফলে সে রমণীজনোচিত লজ্জা, সংস্কার প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া হরলালকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, পরে তাহাকে নির্লজ্জভাবে গোবিন্দ-লালের নিকট প্রেম-নিবেদন করিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় রমণীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা অতি কম, অথবা ক্ষণিক বলিয়া গ্রন্থকার তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া অযথা গ্রন্থ ভারাক্রান্ত করেন নাই।

সামান্য আকর্ষণেই যাহারা হেলিয়া পড়ে, প্রতিরোধ করিবার শক্তি যাহাদের নাই, দ্বন্দ্ব তাহাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না। তাই রোহিণীকে আমরা সর্ব্বদাই কামনার স্রোতেই ভাসিয়া যাইতে দেখিতে পাই। সে কখনও ইহার বেগ রোধ করিবার জন্য বিশেষ

চেষ্টা করে নাই। বারুণী পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া সে যে কাঁদিয়াছিল, তাহা চিত্ত-সংযমের জন্য নহে, নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। গোবিন্দলালের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সে যে মৃত্যু কামনা করিয়াছিল, প্রথমতঃ তাহা ভয়ে—"যদি গোবিন্দলাল ঘুণাক্ষরে একথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না, হয়ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে।" দ্বিতীয়তঃ কামনায় দগ্ধ হইয়া—"জীবন-ভার বহন করা তাহার পক্ষে কষ্টদায়ক হইয়া পড়িয়াছিল।" অতএব এখানেও প্রকৃত সংঘাতের সৃষ্টি হইতে পারে নাই। তারপর ব্যর্থতার বিষাদে সে যে বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এখানেও দেখা যায় যে, সে আত্মসংযমের চেষ্টা না করিয়া নিজের অভাবকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে, এবং প্রকৃত সংঘাত এড়াইবার জন্যই এই সহজ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

ইহার পরে নিশাকরকে দেখিয়া চিত্ত-

চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে তাহার দিকে ঢলিয়া পড়া রোহিণীর পক্ষে অস্বাভাবিক হয় নাই, কারণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি সে জীবনে কখনও আহরণ করিতে পারে নাই। যে রমণী আত্মতৃপ্তির জন্য কুলমান বিসর্জ্জন দিয়া পরপুরুষের সহিত গোপনে চলিয়া আসিতে পারে, অর্থ ও রূপের নিকট পুনরায় আত্মবিক্রয় করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। নিশাকর যে রূপবান্ ও বিত্তশালী তাহা রোহিণী সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিল। যদি কেহ দুর্ভাগ্যবশতঃ এই জাতীয় রমণীর সংস্পর্শে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি রোহিণী-চরিত্রের স্বাভাবিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কামনাতে তাহার উৎপত্তি এবং কামনাতেই তাহার অবসান হইয়াছে। এইভাবে গ্রন্থকার একটা দুষ্প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতিতে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রোহিণীর অভিনয়ের যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন।

প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের আশ্রয়ে যদি সে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, তাহার ঐ স্বাভাবিক বিশেষত্ব লোপ

পাইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত গোলক অর্দ্ধপথেই থামিয়া গিয়া তাহার গতিকক্ষের শেষ সীমায় উপনীত হইতে পারে নাই। অন্য কোন কৌশলের দ্বারা ইহা সংঘটিত করাইলে রোহিণী যে ভাবে গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত কি? বসন্ত-সেনাও সামান্যা নায়িকা মাত্র, কিন্তু কবি তাহাকে তাহার পরিণতির উপযুক্ত করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন। তাহা দ্বারা রোহিণীর ন্যায় কার্য্য করাইবার উদ্দেশ্য থাকিলে তাহার অন্তরও প্রথম হইতেই রোহিণীর ন্যায় কালিমাময় করিতে হইত, নতুবা তাহাই হইত Bad art, অর্থাৎ প্রকৃত শিল্পকৌশলের দিক্ হইতে নিন্দনীয়। বিশেষতঃ প্রত্যেক গ্রন্থে প্রত্যেক চরিত্রের একটা উদ্দেশ্যমূলক নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। মূল পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাহাদের চরিত্রে রেখাপাত করিতে হয়। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল করিয়াও সহস্র রকমে গ্রন্থ রচনা করা যায়, কিন্তু কি করা হয় নাই, তাহা আমাদের বিবেচনার বিষয় নহে। যাহা করা হইয়াছে,

তাহাতে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইলেই গ্রন্থকার দোষের দায় হইতে মুক্তি পাইতে পারেন।

রোহিণীর হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় যেন জড়ীভূত দুর্ব্বলতার সমষ্টিতে রোহিণী গঠিতা হইয়াছিল। একে ত ভোগতৃষ্ণায় সে পাগলিনী, তাহার উপর শক্তিসামর্থ্যহীনা ও স্থিরবুদ্ধিবিরহিতা হওয়াতে সে কাণ্ডারীহীন তরণীর ন্যায় আবেগপ্রবাহে ইতস্ততঃ পরিচালিত হইয়াছে, কখনও স্থির লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে নাই। মধ্যে মধ্যে সংস্কার আসিয়া তাহাকে জাগরিত করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার প্রভাবে ঠেলাগাড়ীর ন্যায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই সে মধ্যপথে থামিয়া গিয়াছে, অথবা গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া বসিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে তিনটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। হরলাল উইল চুরি করাইবার জন্য আসিয়া রোহিণীকে বেগার ধরিয়াছে। প্রত্যুপকারের দাবী করিয়া এবং হাজার টাকার লোভ দেখাইয়া অনুরোধ করাতে রোহিণী বলিল—"চুরি? আমাকে কাটিয়া

ফেলিলেও আমি পারিব না।" অতি উত্তম কথা। আমরা রোহিণীকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অবশেষে প্রসঙ্গক্রমে বিধবা-বিবাহের কথা উত্থিত হইলে রোহিণী বলিল,—"কাগজখানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি কি করিতে পারি।" ঢাল তরোয়াল-হীন নিধিরাম সর্দ্দারকে রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া "মানুষ আমরা নহি ত মেষ" বলিয়া আস্ফালন করিতে দেখিলে আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে পলায়নপর দেখিলে হাস্যসংবরণ করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। রোহিণীও সেইরূপ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিল। তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেও সে চুরি করিতে পারিবে না, মরিতে বলিলে মরিতে পারে তথাপি বিশ্বাস-ঘাতকের কাজ করিতে পারে না, এইরূপ গর্ব্বোক্তির পরেই হঠাৎ তাহার মতটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! সংস্কারের আবেগে সে দুইটি বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু ভোগ-লিপ্সা-রূপ তৃতীয় বাধার নিকটে আসিয়া সে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

আর একটি ঘটনাতে রোহিণী অনুরূপ হৃদয়-

দৌর্ব্বল্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। উইল পরিবর্ত্তিত করিতে যাইয়া সে ধরা পড়িয়াছে। তখন গোবিন্দলাল জামিন হইয়া তাহাকে কৃষ্ণকান্তের কবল হইতে উদ্ধার করিল। প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য সে রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ বৃত্তান্ত আমাকে সকল বিশেষ করিয়া বলিবে কি?" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—কিন্তু যে জাতি জীয়ন্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়া আর্য্যকন্যা।" কি বলিবার জন্য তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল? রোহিণী যে গোবিন্দলালের জন্য চুরি করিতে আসিয়াছিল, তাহা বলিয়া গোবিন্দলালের নিকট প্রেম-নিবেদন করিবার জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীজন-সুলভ লজ্জার বশবর্ত্তী হইয়া সে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতে-ছিল না, ইহাই গ্রন্থকারের বক্তব্য। নিতান্ত নীচ-জাতীয়া স্ত্রীলোকও এই সমস্ত ব্যাপারে প্রথমতঃ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে দ্বিধাবোধ করে। রোহিণী তাহার অতিরিক্ত কিছুই করে নাই। কিন্তু সে

আর্য্যকন্যা। আর্য্যকন্যা সকলেই। যে জীয়ন্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করে সেও আর্য্যকন্যা, আর যে রূপের ব্যবসায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে সেও আর্য়্যকন্যা। গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা ইহাদের পার্থক্য সূচিত হয়, কেবল জন্মদ্বারা নহে। তথাপি এখানে রোহিণীকে 'আর্য্যকন্যা' বলিবার তাৎপর্য্য কি? আর্য্য ও অনার্য্যের বিভিন্নতা চিরপ্রসিদ্ধ। যাহাদের সংস্কার ও কৃষ্টি আছে তাহারাই আর্য্য, আর যাহারা কৃষ্টিহীন তাহারাই অনার্য্য এবং হেয়, এই অর্থেই এই দুইটি শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোহিণীও সংস্কার-বর্জ্জিতা ছিল না। এইজন্যই সংস্কারের প্রভাব সে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সে প্রথমে স্পষ্টভাবে কিছু বলিতে পারে নাই, কিন্তু ইহার পরেই চতুরা রোহিণী নানাপ্রকার চাতুর্য্যপূর্ণ কথা বলিয়া গোবিন্দলালকে জানাইয়া দিয়াছিল যে, সে তাহাকে ভালবাসে। অর্থাৎ আর্য্যকন্যা বলিয়া সংস্কারবশে প্রথমে সে যাহা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, অবশেষে প্রবৃত্তির প্রাধান্য হেতু তাহাই বলিয়া সে নির্লজ্জতার চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন

করিল। ঠেলাগাড়ী একটু অগ্রসর হইয়াই আবার থামিয়া গিয়াছে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। রোহিণীর হৃদয়ে আর্য্যজনোচিত সংস্কার আসিয়া এইরূপে মধ্যে মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বটে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে শোচনীয় দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিয়া বসিয়াছে। ইহাই রোহিণীর চরিত্রের বিশেষত্ব। যাহারা অসামঞ্জস্যের অভিযোগ করেন, তাঁহারা সংস্কারজাত ঐ মৌখিক উক্তিগুলির উপরেই নির্ভর করেন, কিন্তু তাহার ফল যে কি দাঁড়াইল, তাহার প্রতি লক্ষ্য করেন না।

রোহিণীর জীবনের আর একটি ঘটনাও কৌতুকাবহ। গোবিন্দলাল রোহিণীকে হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিয়াছে। রোহিণী যাইতে স্বীকৃতা হইয়া বাড়ীতে আসিয়া ভাবিতেছিল,—"হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না, না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না? আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির।" অবশেষে "এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কালামুখী রোহিণী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া

আবার "পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ"—সেই গোবিন্দ লালের কাছে চলিল। মনে মনে বলিতে লাগিল— "হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়, আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেম-বহ্নি নিবাইয়া দেও—আর আমায় পোড়াইও না।" আবার সংস্কার আসিয়া তাহার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করাতে সে বলিতেছে—"আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল —রহিল কি প্রভু? রাখিব কি প্রভু?" অবশেষে আবার—"হে দেবতা!—হে দুর্গা,—হে কালী,— হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও—আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারিব না।" ইহা যেন ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে কালীপূজা করিয়া দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করা হইতেছে। রোহিণী গ্রাম ছাড়িয়া যাইবে না, এই কথাই বলিতে যাইতেছিল, অর্থাৎ গোবিন্দলাল তাহাকে আত্মরক্ষার যে সুযোগ প্রদান করিয়াছিল, রোহিণী তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেই প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। অতএব তাহার

এইরূপ করুণা-ভিক্ষা অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করার মতই বোধ হয়। ইহাতে সুমতিপ্রদানের যে কথা আছে, এই অবস্থায় তাহার যে কোনই আন্তরিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়! অধঃপাতে যাইবার পূর্ব্বে লোকের মনে যেরূপ আলোড়ন উপস্থিত হয়, গ্রন্থকার এখানে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।[১]

কিন্তু ইহাতে "অসহ্য প্রেমবহ্নির" কথা রহিয়াছে। আবার ইহার পরেই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"তবু সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয় থামিল না।" অন্যত্র—"রোহিণী সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল।" এই সকল উক্তি হইতে হয়ত পাঠকের মনে এই ধারণা জন্মিতে পারে যে, রোহিণী প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দ-

১। তুং—"তাহার এই প্রার্থনার কোনই মূল্য নাই। চিরনিরূঢ় সংস্কার সহসা বিলুপ্ত হয় না, মাঝে মাঝে প্রবল প্রতিকূল শক্তিকে ঠেলিয়া ফেলিয়াও আত্মপ্রকাশ করে" (অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়ের "বঙ্কিমচন্দ্র", ২৯১ পৃঃ)।

লালকে ভালবাসিয়াছিল। বোধহয় এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই অনেকে রোহিণীর চরিত্রের অসামঞ্জস্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে প্রেম বলা যায় কিনা তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। রসশাস্ত্রে কাম ও প্রেমের বিভিন্নতা স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাতে কামের, আর পরপ্রীতির ইচ্ছাতে প্রেমের অভিব্যক্তি হয়। এখন রোহিণী যাহা করিতে যাইতেছিল, তাহা আত্মতৃপ্তির জন্য নয় কি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহাকে প্রেম বলা যাইতে পারে না। সে অনুভব করিয়াছিল একটা আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা, এবং তাহারই প্রভাবে সে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটীয়াছিল। যাহাকে সে ভালবাসে বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছিল, সর্ব্বতোভাবে তাহার অনিষ্ট সাধন করিতেও সে দ্বিধা বোধ করে নাই। তবে কেন গ্রন্থকার "প্রেম", "ভালবাসা" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন? ইহার কারণ এই যে, সাধারণতঃ কামের প্রতিশব্দরূপেও ঐ সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোহিণীর ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াও যদি কোন পাঠক ঐ সকল শব্দগুলির

প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাহা আত্মপ্রতারণা মাত্র। গিরিজাবাবুও লিখিয়াছেন—"আমরা বলিব এখানে 'প্রেম' কথাটি ঠিক্ ব্যবহৃত হয় নাই। অথবা 'প্রেমের' অর্থ এখানে লালসার প্রাবল্য-জনিত হৃদয়ের উদ্বেলিত ভাববিশেষ" (বঙ্কিমচন্দ্র, ৬৯ পৃঃ)। ইহা লইয়া এইরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে, ইহা কল্পনা করিতে পারিলে বঙ্কিম অবশ্যই অধিকতর সতর্কতার সহিত শব্দ নির্ব্বাচন করিতেন।

"রোহিণীর অতর্কিত মৃত্যু, লেখকের প্রথমাবধি উদ্দেশ্যানুযায়ী হইলেও, bad art, কেন না এই পরিণতির জন্য লেখক পাঠকের মনকে যথেষ্টভাবে প্রস্তুত করেন নাই", অর্থাৎ পাপের চিত্র বর্ণনাবাহুল্যে আরও উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তোলেন নাই, এইরূপ ধারণাও অনেকের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে।[১] গোবিন্দলাল ও

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৮৫ পৃঃ। শ্রীকুমার বাবু এই সম্বন্ধে আলোচনাও করিয়াছেন, ঐ ১৮৫-১৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রোহিণী সম্বন্ধীয় আলোচনায় ইহার আংশিক উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থকারের শিল্প-চাতুর্য্যের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করিলেই এই অভিযোগের অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হইতে পারে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে কৃষ্ণকান্তের উইলের "বঙ্কিম-শতবার্ষিক" সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ভূমিকায় সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয় লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের সহিত তুলনা করিলে 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁহার বর্ণনা-বাহুল্যের অভাব এবং আড়ম্বরহীনতা। আয়োজন এবং উপকরণ খুব অল্প, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলি ছাড়া গ্রন্থকার বাহিরের কোনও অলঙ্কার অথবা অতিশয্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। দক্ষ মূর্ত্তিকারের মত যে মাটির তাল লইয়া তিনি উপন্যাস রচনা সুরু করিয়াছেন, সমাপ্তিশেষে দেখা যাইতেছে, তাহার এক কণিকাও অবশিষ্ট নাই, অথবা একটি কণিকারও অভাব ঘটে নাই। এমন অপরূপ শিল্পচাতুর্য্য, এমন সংযত ভাব-প্রকাশ,

বৈজ্ঞানিক ঘটনা-বিন্যাস এবং সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবোধ বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন উপন্যাসে দৃষ্ট হয় না। মনে হয় বঙ্কিমের লিপিচাতুর্য্য কৃষ্ণকান্তের উইলে চরমে পৌঁছিয়াছে।" (ঐ, ১/০ পৃঃ)। শ্রীকুমার বাবুও লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণকান্তের উইলে বিশেষ বর্ণনা-বাহুল্য নাই; লেখক নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলিতেই আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ২৮৮ পৃঃ)। ইহাই যদি গ্রন্থ-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত হয়, তাহা হইলে "যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব" বঙ্কিমের নিজের এই উক্তির পরেও "Bad art" এর পরিকল্পনা করা যাইতে পারে কি? সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রোহিনীর ন্যায় একটি অপ্রধান চরিত্রের প্রতিই লোকের দৃষ্টি এমন ভাবে পতিত হয়! বোধ হয়, রোহিণী রমণী বলিয়াই তাহার দরদীর অভাব নাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অন্যতম প্রধান চরিত্র গোবিন্দলালের পরিণতিতেই বরং সমবেদনার উদ্রেক হওয়া উচিত।

গ্রন্থকারও বলিয়াছেন—"ভ্রমর দর্শনের লালসা বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, গোবিন্দলালকে দাহ করিতে লাগিল। কে এমন পাইয়াছিল? কে এমন হারাইয়াছে? ভ্রমরও দুঃখ পাইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্য-দেহে অসহ্য। ভ্রমরের সহায় ছিল—যম। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।" সিংহ দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া শৃগাল-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। ভ্রমরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবার পূর্ব্বে তাহার উপর দিয়া যে ঝড় প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার বর্ণনাও গ্রন্থকার প্রদান করেন নাই। ভ্রমরের নিকট প্রদত্ত পত্রে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় মাত্র। আবার ভ্রমরের মৃত্যুর পরে বার বৎসর সে কিভাবে অবস্থান করিয়াছিল তাহাও আমরা জানিতে পারি না। অথচ গ্রন্থের এই সকল অভাবের প্রতি লোকের দৃষ্টি উপযুক্তরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান না করিয়া কেবল মাত্র আভাসেই

পাঠককে চিন্তা করিবার অবসর প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থটি সর্ব্বতোভাবে উপভোগ্য হইয়াছে। অতএব ইহা Bad art নহে, কিন্তু প্রভূত শিল্প-চাতুর্য্যেরই পরিচয় প্রদান করে। অক্ষমতাই Bad art-এর জননী, কিন্তু যেখানে স্বেচ্ছাকৃত সুচিন্তিত কৌশলের নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেখানেই দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন গোবিন্দলালের ভূমিকা গ্রহণ করা যাইতেছে। উপক্রমভাগে দেখা যায় যে, রূপযৌবন-সম্পন্ন গোবিন্দলাল জমিদারের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভ্রমরও সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের কন্যা এবং জমিদার গৃহের বধূ, তদুপরি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই উভয়ের গুণমুগ্ধ। ইহাদের উপর দিয়া পরবর্ত্তীকালে যে ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহার শোচনীয় পরিণতির চিত্র স্পষ্টতর করিবার জন্য গ্রন্থকার এইভাবে পটভূমি প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন।

গোবিন্দলালের হৃদয়ে সুপ্ত রূপতৃষ্ণা অবস্থান করিতেছিল বলিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, কিন্তু সংযমের বন্ধনে সে এমন ভাবেই ইহাকে

সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সে সজাগ ছিল না। সমুদ্রের ঢেউ যদি সমুদ্রেই লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তটভূমি ব্যথিত হয় না। কিন্তু রোহিণীকে বারুণী পুষ্করিণী হইতে উদ্ধার করিবার কালে গোবিন্দলালের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতেই তাহার জীবনে প্রথম সংঘাতের সৃষ্টি। সংঘাত কেন? যেহেতু গোবিন্দলাল ঐ আকর্ষণেই আত্মদান করিয়া বসে নাই, কিন্তু তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য বন্দর-খালিতে চলিয়া গিয়াছিল। একদিকে আকর্ষণ, অপরদিকে তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা, এই প্রকার দুইটি বিপরীতমুখিনী শক্তির দ্বন্দ্বেই প্রকৃত সংঘাতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, এই সময়ে গোবিন্দলাল ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল—"তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও, আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।" তদনুযায়ী চেষ্টা করিতেও সে বিরত হয় নাই। ইহাতেই আমাদের প্রশংসার দৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত হয়। তারপর মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রন্থকার ট্রাজিডি রচনায় প্রবৃত্ত

হইয়াছেন। ট্রাজিক চরিত্রগুলির কিছু শোচনীয় বিশেষত্ব থাকে। গোবিন্দলালের পলায়নে দেখা যাইতেছে যে, শোচনীয় পরিনতির দিকে অগ্রসর হইবার মত শক্তি এখনও সে লাভ করিতে পারে নাই।

তারপর আসিল অভিমানের পালা। ভ্রমরের অবিশ্বাসে সে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল। যে শক্তির অভাবে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, অভিমানের উত্তেজনায় সেই শক্তি লাভ করিয়া এখন সে প্রচণ্ডবেগশালী উল্কাপিণ্ডের ন্যায় গতিশীল হইল। ইহাই তাহার ট্রাজিক্ চরিত্রের প্রথম সূচনা। ইহারই প্রভাবে ভ্রমরকে শাস্তি প্রদানের জন্য সে রোহিণীর দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে কৃষ্ণকান্তের শেষ উইলের ফলে সে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

গোবিন্দলালের এই পতনে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয় না কি? গ্রন্থকার ঘটনার পর ঘটনা এমন সুকৌশলে সমাবেশ করিয়াছেন যে, গোবিন্দলালকে যেন বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার আবর্ত্তে

পড়িয়া ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। রূপতৃষ্ণায় যে তাহার অধঃপতন হয় নাই তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। রোহিণী-প্রীতি ভ্রমরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের উপায়রূপে কার্য্য করিয়াছে, অতএব মুখ্য নহে, গৌণ। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যভিমানেই সে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র, অতএব অচিরস্থায়ী। রোহিণীর ন্যায় দুষ্প্রবৃত্তিবশে যাহারা বিপথে গমন করে, তাহাদের প্রতিই বিতৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু ভ্রান্তি-বশে যাহারা দুর্দ্দশায় পতিত হয়, তাহাদের প্রতিই সহানুভূতির উদ্রেক হয়। গ্রন্থকার এমন কৃতিত্বের সহিত ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন যে, গোবিন্দ-লাল যখন ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য রোহিণীর চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেছে, তখন তাহার কানে কানে বলিতে ইচ্ছা করে—"এইভাবে আত্মহত্যা করিও না, এই মেঘ ক্ষণস্থায়ী"। আবার যখন সে ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করিতেছে তখনও তাহার হস্ত ধরিয়া নিষেধ করিতে ইচ্ছা করে। এইভাবে ঘটনার সমাবেশ দ্বারা গ্রন্থকার গোবিন্দলালের প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ইহার পর প্রতিক্রিয়া। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই গোবিন্দলাল বুঝিয়াছিল—“এ রোহিণী, ভ্রমর নহে।” অতএব তাহার মোহও ভ্রান্তি কাটিয়া গিয়াছিল। অভিমানও এখন নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ ভ্রমরকে শাস্তি দিবার জন্য রোহিণীকে গ্রহণ করাই যাহার লক্ষ্য, রোহিণীকে গ্রহণ করার পরেই তাহার আবেগ মন্দীভূত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এখনও কৃষ্ণকান্তের উইল এবং তাহার নিজের অতীত ব্যবহার গোবিন্দলালের প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অতএব তখন তাহার নিকট “ভ্রমর অপ্রাপনীয়া এবং রোহিণী অত্যাজ্যা, ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।” রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতা পরে তাহাকে এই সঙ্কটময় অবস্থা হইতে মুক্তিদান করিয়াছিল। কিন্তু হত্যাকারী বলিয়া আর সে ভ্রমরের নিকট মুখ দেখাইতে সাহসী হয় নাই। অতএব প্রতিক্রিয়াভাগেও দেখা যাইতেছে যে, সংঘাতের পর সংঘাত আসিয়া গোবিন্দলালের চিত্ত মথিত করিয়া তুলিয়াছিল। অন্যতম প্রধান চরিত্র বলিয়া গ্রন্থকার তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয়

প্রদান করিতে অণুমাত্রও কার্পণ্য করেন নাই। গোবিন্দলালকে সর্ব্বদাই আমরা প্রতিকূল ঘটনার সহিত বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে দেখিতে পাই। প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় প্রতি পদক্ষেপে সে জটিলতর অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, আবার পরাজয়েও কাপুরুষের ন্যায় নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করে নাই, বরং পূর্ব্বানুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতীকার কল্পেই অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতেও তাহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত যাতনার আভাস প্রদান করিয়া গ্রন্থকার তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতির সীমা বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন।

শিল্প চাতুর্য্যের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, গ্রন্থকার গোবিন্দলালের মধ্যে প্রকৃত ট্রাজিক চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উত্তেজনাবশে তাহার কর্ম্মশক্তি অপরিমেয় হইয়াছিল। কেবল যে ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিবার কালেই ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা নহে, রোহিণীর হত্যা ব্যাপারেও ইহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। আবার রোহিণীর হত্যায় আমরা যে গোবিন্দলালের রুদ্রমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই গোবিন্দ-

লালকেই ভ্রমরের মৃত্যুর পরে ভ্রমরের স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া ভোলানাথের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে দেখিতে পাই। তাহার আত্মহত্যা ও সন্ন্যাস-গ্রহণ আত্মাহুতির বিভিন্ন রূপ মাত্র। এইরূপ কর্ম্মপ্রবণতা ট্রাজিক্ চরিত্রের অনন্য-সাধারণ বিশেষত্ব। তাহারা হত্যা করিতে পারে, আবার প্রয়োজন বোধ করিলে নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। রোহিণীর ন্যায় নিজের অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াও "আমায় মারিও না, মারিও না" বলিয়া মায়া কান্না জুড়িয়া দেয় না।

গ্রন্থকার গোবিন্দলালের জীবনে শোচনীয় আবেগের তিনটি তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন। গৃহত্যাগে প্রথম এবং রোহিণীর হত্যায় দ্বিতীয় তরঙ্গের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ভ্রমরের মৃত্যুতে তৃতীয় তরঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল। সন্ন্যাস গ্রহণে বা আত্মহত্যায় তাহার পরিণতি লক্ষিত হইয়া থাকে। একই চরিত্রের উপর এইরূপে তিনবার প্রবল তরঙ্গের সংঘাত আনয়ন করা যে অদ্ভুত শিল্প-চাতুর্য্যের নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, ওথেলোর ন্যায় আত্মহত্যা না করাতে গোবিন্দলালের দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ওথেলো নিরপরাধা ডেস্‌ডি-মোনার মৃত্যুর পরেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ভ্রান্তিবশে সে প্রণয়িনীকে চরম নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করিয়াছে। তখন আত্মহত্যা ভিন্ন তাঁহার সম্মান রক্ষার গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু গোবিন্দ-লাল নিজ চক্ষে দেখিয়া বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড বিধান করিয়াছিল, তাই ওথেলোর ন্যায় অনু-শোচনার তীব্রতর প্রভাব সে অনুভব করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ ভ্রমরের মৃত্যু ডেস্‌ডি-মোনার ন্যায় আকস্মিক হয় নাই। রোগে ভুগিয়া সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। গোবিন্দলাল পূর্ব্বেই এই পরিণতির জন্য প্রস্তুত হইবার অবসর পাইয়াছিল বলিয়াই ধৈর্য্যের সহিত এই আঘাত সহ্য করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। বঙ্কিম প্রথমে আত্মহত্যারই উল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করিয়া প্রকৃত শিল্প-দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

৪—O. P. 64

গোবিন্দলালের জীবনের এই পরিণতি আমাদিগকে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। সামান্য কারণে উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া সে যে ভ্রান্তিবশে দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারি না, এবং সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতিতে আমাদের হৃদয় ভরিয়া উঠে। ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে একবার শনি প্রবেশ করিলে সে যে কিরূপ অনিষ্ট-সাধন করিতে পারে, তাহাই এই আখ্যায়িকায় আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহাতে আমরা নৈতিক সতর্কতা অবলম্বনের প্রেরণা লাভ করি। আবার অপরাধ সে করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই। ইহাতেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। সন্ন্যাস-গ্রহণে গোবিন্দলাল হৃতরাজ্যে নিজেকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যে পঙ্কে ক্ষণকালের জন্য সে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তাহা যে কখনও তাহার হৃদয়কে কালিমাময় করিতে পারে নাই, রোহিণীকে গ্রহণ করার পরেই অতৃপ্তিতে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, নতুবা কামুক গোবিন্দলালের পক্ষে কামিনী রোহিণীর সাহচর্য্য

এত শীঘ্র অপ্রীতিকর হইয়া উঠিত না। এইজন্য আকস্মিক পতনের পরেই উত্থানের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া গোবিন্দলালের চরিত্রে গ্রন্থকার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্কিম-জীবনী"তে লিখিয়াছেন—"গোবিন্দলাল গোড়ায় দেবতা, মধ্যে মানুষ, শেষে পশু" (ঐ, ২৬০ পৃঃ)। বোধ হয় রোহিণীর হত্যা লক্ষ্য করিয়াই তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু গোবিন্দলালের পরবর্ত্তী জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সে এতটাই উন্নতি লাভ করিয়াছিল, যাহা আমাদের অদৃষ্টে দুই এক জীবনে হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়। অতএব ইহাই বলা সঙ্গত যে, গোবিন্দলাল প্রথমে দেবোপম, মধ্যে মানুষ, অবশেষে দেবতা, কারণ তখন সে "ভ্রমরাধিক ভ্রমর" লাভ করিতে পারিয়াছিল। এইজন্য কামনার প্রতিমূর্ত্তি রোহিণীর হত্যা, অথবা গুণময়ী ভ্রমরের বন্ধন ছিন্ন করা যে অপরিহার্য্য ঘটনা তাহা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। কর্ণ

পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়াও "দাতা" বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন, পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়াও মহাপুরুষ। গ্রন্থকারও এইরূপ বিবিধ অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া গোবিন্দলালকে চালিত করিয়া খাঁটি সোনায় পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইহাই যে গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, চরিত্র-বিশ্লেষণের কালে তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে কেন?

গোবিন্দলাল-সম্বন্ধীয় দুই একটি মন্তব্য গ্রন্থকারের কিছু অসাবধানতার পরিচায়ক বলিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে। গোবিন্দলালের অধঃপতনের সময়ে তিনি লিখিয়াছেন—"রূপতৃষ্ণা অনেকদিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে।" অথচ ইহার পূর্ব্বে গ্রন্থ-মধ্যে ইহার আভাসও তিনি প্রদান করেন নাই। কিন্তু যাবতীয় ঘটনাই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট বলিয়া রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে গোবিন্দলালের অবচেতন মনে যে রূপতৃষ্ণা গোপনে অবস্থান করিতেছিল, তাহার প্রতি নির্দ্দেশ প্রদান করাই উক্ত প্রকার মন্তব্যের উদ্দেশ্য। গোবিন্দলালের এই দুর্ব্বলতার উল্লেখ না করিলে তাহার অধঃপতনের বর্ণনাও এই

আখ্যায়িকায় অস্বাভাবিক হইয়া পড়িত। অতএব ইহাতেও গ্রন্থকারের প্রভূত চিন্তাশীলতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ভ্রমর চরিত্র চিত্রণেও গ্রন্থকার অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দক্ষের মুখে পতির নিন্দা শুনিয়া সতী অভিমানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম ভ্রমরকে সেই আদর্শে সৃষ্টি করিয়াছেন! সতীর অভিমান হইয়াছিল পিতার ব্যবহারে, আর পতিগত-প্রাণা ভ্রমরের অভিমান হইয়াছে পতির প্রতি সন্দেহের বশে, এইমাত্র প্রভেদ। অতএব ভ্রমর-চরিত্রের আলোচনায় এই অভিমানের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি গ্রন্থকার কিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রন্থকার ট্রাজিডি-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং ভ্রমর এই গ্রন্থের প্রধানা নায়িকা। এই ভূমিকায় অভিনয় করিবার মত শক্তি তাহাকে প্রদান না করিলে গ্রন্থ অচল হইয়া পড়িত। অভিমানের প্রাণ গর্ব্ব। গর্ব্বহীন অভিমান শক্তিবর্জ্জিত শিবের ন্যায় শবে পরিণত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। অতএব

ট্রাজিডির নায়িকারূপে ভ্রমরের হৃদয়ে তেজোবীর্য্য-গর্ব্বাদির সন্নিবেশ করা গ্রন্থের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এখন প্রধান বিচার্য্য বিষয় এই যে, গ্রন্থকার কিরূপ নিপুণতার সহিত ইহাদের সমাবেশ করিয়াছেন।

ঐশ্বর্য্যশালী রূপযৌবনসম্পন্ন দেবোপম পতির প্রেমে আত্মহারা হইয়া ভ্রমর সুখে কাল যাপন করিতেছিল, অকস্মাৎ সহস্রমুখে পতির নিন্দা ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইহার ফলে আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগাতে পতিপত্নীর শাশ্বত বাধ্যবাধকতার ধারণা লইয়া যে ভ্রমর অভিমানিনী হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। গোবিন্দলালের নিকট পত্রে ইহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়া সে পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল। ইহা হইতেই সংঘাতের প্রথম সৃষ্টি, এবং এখানেই ভ্রমর-চরিত্র রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

তারপর হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া অভি-মানের সেই প্রাথমিক উত্তেজনায় ভ্রমর তাহার গর্ব্বোন্নত মস্তক অবনত করিতে পারে নাই। তখনকার অবস্থা-বর্ণনায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"আগে যখন গোবিন্দলাল-ভ্রমর একত্র থাকিত, তখন গোবিন্দলালকে ডাকিলে কেহ সহজে পাইত না—ভ্রমরকে ডাকিলে একেবারে পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না—হয় 'বড় গরমি' নয় 'কে ডাকিতেছে' বলিয়া একজন উঠিয়া যায়।" অবস্থা যে এইরূপ জটিলতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহার মূলে ছিল গোবিন্দলালের প্রত্যভিমান, রোহিণী, এবং কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল। গ্রন্থকার ভ্রমরকে এইরূপ প্রতিকূল আবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত করিয়া শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ করিয়াছেন। যে শক্তির বলে সে গোবিন্দলালের উপর নির্ম্মম অভিমান করিতে পারিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে আত্মজয় করিয়া সে এখন যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে লাগিল। পিত্রালয়ে যাইবার জন্য সে পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, এবং গোবিন্দলালের নামে এক দানপত্রও রেজেষ্টারী করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু যাহাই সে করিয়াছে তাহাতেও নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। গ্রন্থকার আঘাতের পর আঘাত আনিয়া তাহাব হৃদয়ে

তরঙ্গ উত্থিত করিয়া দিয়াছেন। উইল পড়িয়া আসিয়া যখন গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিল যে, তাহার বিষয় সে ভোগ করিবে না, তখন—"ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল, কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল—তবে কি করিবে?" তারপর যখন গোবিন্দলাল বলিল—"আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব", তখন—"ভ্রমর পদত্যাগ করিল, উঠিয়া বাহিরে যাইতেছিল, চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।" তারপর যখন গোবিন্দলাল মাতাকে লইয়া কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন একদিন—"ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁন্দিতে লাগিল—বলিল—'কতদিনে আসিবে বলিয়া যাও।' গোবিন্দলাল বলিল—বলিতে পারি না, আসিতে বড় ইচ্ছা নাই।

ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মনে ভাবিল—ভয় কি? বিষ খাইব।"

আবার বিদায় লইবার সময়ে যখন গোবিন্দ-লাল বলিল যে, তাহার ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই, তখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল—

"ধর্ম্ম নাই কি ?" গো—"বুঝি আমার তাও নাই।"

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল।" অবশেষে ভ্রমর তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া ভক্তি-ভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। মনে হইল যেন আমরা এক অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখীন হইয়াছি। যে ভ্রমর আদরে-সোহাগে গলিয়া গিয়া শত আব্দারে গোবিন্দলালকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, আজ তাহার মধ্যে সেই কোমলতার লেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার যেন নীলোৎপল-পত্রধারে শমীবৃক্ষ-ছেদনের তীক্ষ্ণতা অর্পণ করিয়াছেন। ইহা না করিতে পারিলে প্রকৃত ট্রাজিক্ চরিত্র গঠন করা যায় কি ?

এইরূপ তেজ না থাকিলে যে, সতী সতী হইতে পারিতেন না, এবং দৌপদীও মহাভারতের নায়িকার আসন অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন না। বঙ্কিম ঐরূপ তেজ আহরণ করিয়া ভ্রমরের হৃদয়ে নিহিত করিয়াছেন, অথচ ঐসকল প্রাচীন

আখ্যায়িকার ন্যায় সুকৌশলে ঘটনার সমাবেশ করিয়া নিজের কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াভাগেই ভ্রমরের বিশিষ্টতা বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সময়েই গোবিন্দলালের প্রার্থনাপূর্ণ পত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। একদিকে ধর্ম্ম ও সমাজের অনুশাসন, অপরদিকে চির-আকাঙ্ক্ষিত মিলনের লোভ, কিন্তু কিছুই ভ্রমরকে তাহার উচ্চ আদর্শ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। ইহার কারণ ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্ত্রী চরিত্রের এইরূপ কঠোরতার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। প্রিয়জনের অনিষ্ট করিবার ভয়ে শ্রী সীতারামকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। স্বামীকে মহৎ কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য শান্তি পত্নীত্বকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া নারীত্বের মহিমায় মহনীয়া হইয়া রহিয়াছে। প্রাচ্য সাহিত্যে ইহা বঙ্কিমের নব অবদান। ইঁহারা সকলেই মহীয়সী নারীমূর্ত্তি, অথচ ধর্ম্ম ও সমাজের বিধিনিষেধ তুচ্ছ করিয়াও বঙ্কিম ইঁহাদিগকে সীতা-সাবিত্রীর ন্যায় উচ্চতম আদর্শেই সুপ্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন। বস্তুতঃ পত্নীত্ব বড়, না, নারীত্ব বড়? নারীই সংসার মধুময় করিবার জন্য মাতা, কন্যা বা পত্নীর আসন অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। গ্রন্থকার ন্যায়ের দণ্ড ভ্রমরের হস্তে প্রদান করিয়া শ্রেষ্ঠ শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাকেই বলে অরূপকে রূপ দেওয়া, অর্থাৎ আর্টের জন্যই আর্ট। নতুবা রমণীর নগ্ন সৌন্দর্য্য ও নির্লজ্জ কামকেলীর বর্ণনায় আর্ট হয় না। বাহ্যিক মানবিকতাও কল্পনার চরম লক্ষ্য নহে। ইহা বাস্তবতার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। বাস্তবতাকে অতিক্রম করাতেই আর্টের সার্থকতা।

ভ্রমর-চরিত্রে বঙ্কিম হিন্দুধর্ম্মের জয় গান করিয়াছেন ইহাও বলা যাইতে পারে না, কারণ সে ধর্ম্ম ও সমাজের শাসন উপেক্ষা করিয়া নির্ম্মম কঠোরতার সহিতই স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। গ্রন্থকারের কৃতিত্ব এই যে, এই অবস্থাতেও তিনি ভ্রমরকে সতী-শিরোমণি রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। স্বামীর জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সে মর্ত্ত্যভূমে দক্ষকন্যা সতীর আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে। তাহাকে আদর্শ রমণীর আসনও প্রদান করা

যাইতে পারে। বঙ্কিম অন্যত্র বলিয়াছেন—"মনুষ্যগণ কার্য্যতঃ স্নেহকে ধর্ম্ম হইতে পৃথগ্ভূত রাখিয়াছে, এই জন্য ভালবাসার অত্যাচার-নিবারণ জন্য ধর্ম্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক" (ভালবাসার অত্যাচার নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ভ্রমরও এতদতিরিক্ত কিছুই করে নাই।[১] অধিকন্তু মহৎ আদর্শের জন্য ধর্ম্ম ও সমাজের

১। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ভ্রমরের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"শিল্পরচনারূপে উপভোগ করিবার জন্য ইহা একটি আদর্শ চরিত্র বটে" (বঙ্কিমচন্দ্র, ২৯৮ পৃঃ)। যাঁহারা বলেন—"ভ্রমরকে যদি আদর্শ রমণী করিয়া তিনি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহা সফল হয় নাই" (গিরিজাবাবুর "বঙ্কিমচন্দ্র", ৫২ পৃঃ), তাঁহারা বোধ হয় সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী হিন্দু পত্নীর আদর্শের প্রতিই লক্ষ্য করেন। বস্তুতঃ হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় হিন্দু রমণীর এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াই ভ্রমরকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করেন নাই (বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, ১০৭-৮ পৃঃ), যদিও চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভ্রমরকে একটি অতি উচ্চাঙ্গের হিন্দু রমণী রূপে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভ্রমরের ধর্ম্মের অভিমান বুঝি দেববুদ্ধিরও অবোধ্য ("ত্রিধারায়" "দুইটি হিন্দুপত্নী" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

সঙ্কীর্ণতম গণ্ডীও অতিক্রম করা যাইতে পারে। রোহিণী কামাতুরা হইয়া কুলত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া নিন্দনীয়া, কিন্তু বুদ্ধ ও চৈতন্যপ্রমুখ মহাত্মাগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়াও মহনীয় হইয়া রহিয়াছেন। মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধার যোগ্য করিয়া দেখিতে পারিয়াছিল বলিয়াই ভ্রমর তাঁহাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আদর্শের মূলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া অসাধারণত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে—পত্নীত্বের মোহ তাহার প্রসারতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। বঙ্গসাহিত্যে ভ্রমর অতুলনীয়া এবং "কৃষ্ণকান্তের উইল" সুচিন্তিত ও সুলিখিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ট্রাজিডি।

প্রধান চরিত্র কে ?

কৃষ্ণকান্তের উইলে প্রধান চরিত্র কে ? ইহার সহজ উত্তর এই যে, গ্রন্থমধ্যে যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আখ্যায়িকা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই প্রধান চরিত্ররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা বিচার করিবার কালে প্রাধানতঃ তিনটি চরিত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়—গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী। তন্মধ্যে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মধ্যে বিরোধ-সংঘটনকারিণীর ভূমিকায় রোহিণী অভিনয় করিয়া গিয়াছে। এই কার্য্যে প্রধান সম্বল ছিল তাহার অপরিমিত রূপযৌবন, কিন্তু ইহা অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া প্রথম হইতেই তাহার চেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছিল, কারণ রূপের প্রভাবে সে কখনও স্বকার্য্য সাধন করিতে পারে নাই। হরলাল তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর রূপসম্ভার লইয়া গোবিন্দলালের নিকট পুনঃপুনঃ প্রেম-নিবেদন করিয়াও সে তাহাকে

বিচলিত করিতে পারে নাই। অবশেষে নিরাশ-হৃদয়ে সে বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, অর্থাৎ বাহ্যিক রূপের প্রভাবে সংযমের ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সে স্বতঃই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছে। ইহার পরে যখন গোবিন্দলালের হৃদয়ে তরঙ্গ উত্থিত হইল, তখন রোহিণীর অচেতনাবস্থা। এখানেও গ্রন্থকার রোহিণীর আত্মকর্ত্তৃত্ব লোপ করিয়া দিয়াছেন। তারপর পুনর্জীবন লাভ করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জভাবে প্রেম-নিবেদন করিয়াও সে গোবিন্দলালকে তাহার রূপ-মদিয়া পান করাইতে প্রমত্ত করিতে পারে নাই। এই পরাজয়ই তাহার রূপগরিমাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাঞ্ছিত করিয়াছে। অবশেষে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের অভিমান তাহার সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সুযোগে তাহার বাসনা চরিতার্থতা লাভ করিল বটে, কিন্তু রূপের মোহে সে নিজেই নিশাকরের পিছনে ছুটিয়াছিল। গ্রন্থকার এইরূপে তাহার এক প্রধান অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

তাহার দ্বিতীয় অস্ত্র চতুরতাও তাহার উদ্দেশ্য

সাধনের সহায় হইতে পারে নাই, বরং তাহার হত্যার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হরলালের সহিত বিবাহের প্রলোভনে মোহিত হইয়া সে উইল চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু হরলালের প্রত্যাখ্যানে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে নাই। পুনরায় গোবিন্দলালের প্রতি অনুরাগবশতঃ সে উইল পরিবর্ত্তিত করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছে, এবং এই সুযোগে চাতুর্য্যপূর্ণ উক্তিতে গোবিন্দলালের নিকট প্রেম-নিবেদন করিয়াও সে গোবিন্দলালকে বিচলিত করিতে পারে নাই। এইরূপে তাহার চাতুর্য্য পুনঃপুনঃ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। অবশেষে কৌশলে গোবিন্দলালকে প্রতারিত করিতে যাইয়া সে নিশাকরের কৌশলের নিকট পরাজিত হইয়াছে, এবং ধরা পড়িয়া চতুরতার শাস্তিস্বরূপ গোবিন্দলালের নিটক হইতে চরমদণ্ড লাভ করিয়াছে। এইরূপে গ্রন্থকার তাহার প্রধান দুইটি অস্ত্রই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

ইহার ফলে সে সর্ব্বদাই অন্যের প্রভাবে পরিচালিত হইয়াছে। প্রথমতঃ হরলাল, দ্বিতীয়তঃ

গোবিন্দলাল, এবং অবশেষে নিশাকর, এই তিনটি গ্রহ প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার যাবতীয় কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছিল। অতএব সে সর্ব্বদাই অন্যের দ্বারা চালিত হইয়া অপ্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়া গিয়াছে, আত্ম-কর্ত্তৃত্বের অভাবে কখনও প্রথম স্তরে উন্নীত হইতে পারে নাই। মৃচ্ছকটিক নাটকে বসন্তসেনা তাহার ন্যায় সামান্যা নায়িকা হইয়াও প্রেমের মাহাত্ম্যে স্বকীয়া পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল। কিন্তু একনিষ্ঠতার অভাবে রোহিণী কখনও উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতে পারে নাই। এই সকল কারণে তাহাকে প্রধান চরিত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

এখন গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মধ্যে কে প্রধান চরিত্রের আসন অধিকার করিয়াছে, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই মন্ত্রের সার্থকতা হইয়াছিল তাহাদের অন্তরের মিলনে। পরস্পর নির্ভরশীল আত্মপর-ভেদশূন্য দুইটি মুগ্ধহৃদয় প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধনে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।

প্রথম অবস্থায় হরিদ্রাগ্রামে আমরা এই যে স্বর্গের সুষমা প্রতিভাত দেখিতে পাই, তাহার মূলে ছিল ভ্রমর—রূপহীনা হইয়াও নিজগুণে স্বামীকে লইয়া সে এক নন্দন কানন গঠিত করিয়া লইয়াছিল। তারপর সয়তান আসিয়া অভিমানরূপে তাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। ইহার প্রভাবে তাহারা উভয়েই চালিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অভিমানী গোবিন্দলাল অপেক্ষা অভিমানিনী ভ্রমর শ্রেষ্ঠা। ভ্রমরকে শাস্তি প্রদানের সহস্র পন্থা থাকা সত্ত্বেও গোবিন্দলাল নিজের অনিন্দ্যনীয় চরিত্র বিসর্জ্জন দিয়া ভোগের দিকে অগ্রসর হইতে দ্বিধা বোধ করে নাই, আর ভ্রমর চিরবাঞ্ছিত গোবিন্দ-লালের সঙ্গ হইতে নিজকে বঞ্চিত করিয়া ত্যাগের পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। গোবিন্দলাল যেন মনে করিয়াছিল যে, একমাত্র ভ্রমরের জন্যই তাহার সচ্চরিত্র থাকা প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণকান্তের উইল যখন বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হইতেছিল, তখন বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন—"তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্য, তাঁহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম্ম পরের সুখের জন্য, আপনার

চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন জন্য নহে। ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মের জন্য নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধঃপতন হইল।" (বঙ্গদর্শন, ১৮৮৪, ২১৬ পৃঃ)। যখন কৃষ্ণকান্তের শেষ উইলের পরে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভ্রমরের বিচার বুদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন সে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। বিচ্ছেদের অবস্থায় স্বামীর সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য ভ্রমর কোন চেষ্টারই ত্রুটি করে নাই, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কবলে অগ্রসর হইয়াছে। সর্ব্ববিধ ভোগ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া কঠোরব্রতচারিণী যোগিনীর ন্যায় সে কালযাপন করিয়াছে। বঙ্কিম অন্যত্রও বলিয়াছেন—"যে প্রণয়ী প্রণয়-পাত্রের মঙ্গলার্থে আপনার প্রণয়জনিত সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারিল সে-ই প্রণয়ী" (ভালবাসার অত্যাচার নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ইহাতে তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের মাহাত্ম্যই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে! বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার

সন্মুখীন হইয়াও ভ্রমর আত্মশক্তিবলে সকল তুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলাল যেন আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। গ্রন্থকার কৌশলে বিবিধ ভূতের বোঝা তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাকে জড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। তথাপি তাহার সুদীর্ঘ প্রবাসের মধ্যে সে ভ্রমরের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই ভ্রমর ও রোহিণীর বিভিন্নতা সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। রোহিণীর হত্যাতেও আমরা ভ্রমরের প্রভাব কার্য্যকরী দেখিতে পাই। ভ্রমরের গুণে অতিমাত্র মোহিত হইয়াছিল বলিয়াই রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতায় সে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারাই ফলে হত্যার পূর্ব্বে তাহাকে ভ্রমর ও রোহিণীর সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। আলোকের সন্ধান যে না পাইয়াছে, সে অন্ধকারের গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারে না। রোহিণীর হত্যার পরে আত্ম-গোপন করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার কালে ভ্রমরের অভাবে সে শান্তি লাভ করিতে পারে নাই।

তাই অবশেষে ভ্রমরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার সঙ্গ লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ভ্রমরের ইঙ্গিতে আর তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে সাহসী হয় নাই। অবশেষে ভ্রমর মরিয়াও গোবিন্দলালকে সন্ন্যাসী করিয়া গিয়াছে। বার বৎসর পরে যখন সে আবার হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া আসিল, তখনও তাহার চিত্ত আমরা ভ্রমরময়ই দেখিতে পাইতেছি। এইরূপে ভ্রমর গোবিন্দলালের উপর তাহার অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া অভিনয় করিয়া গিয়াছে। প্রেমে, হৃদয়বলে, ত্যাগে, চরিত্র এবং উচ্চাদর্শের মহনীয়তায় সর্ব্বতোভাবে ভ্রমরকেই শ্রেষ্ঠ চরিত্রের আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় এই যে, ভ্রমর ও রোহিণী কাহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? গোবিন্দলালের উপর তাহাদের প্রভাবের ক্রিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য নয় কি? তাহাদের অন্তর্দ্ধানের পরেও গোবিন্দলালকে বাঁচাইয়া রাখিয়া কবি তাহাকেই প্রধান চরিত্ররূপে গ্রহণ করিবার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। সাংখ্যের মতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই

ক্রিয়াশীলা, কিন্তু সে জন্য প্রধানের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। ভ্রমরকে এতটা উচ্চগ্রামে অধিষ্ঠিত না করিলে যে তাহার প্রতি গোবিন্দলালের অত্যধিক আকর্ষণও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িত। অতএব প্রকৃতির এই উদ্দাম লীলার অন্তরালে এই গ্রন্থে প্রধানরূপী গোবিন্দলালকেই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ও লিখিয়াছেন—"ভ্রমর-চিত্র গোবিন্দলালের চিত্র স্ফুটন জন্য, না, গোবিন্দলালের চরিত্র ভ্রমর-চরিত্র স্ফুটন জন্য? আমাদের বিশ্বাস, গোবিন্দলালের চরিত্র স্ফুটন জন্যই ভ্রমরের আবশ্যকতা হইয়াছিল (বঙ্কিমচন্দ্র, ৫৬-৫৭ পৃঃ)। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থের আখ্যায়িকার গতি ও পরিণতি বিচার করিয়াই প্রধান চরিত্র সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। "কপালকুণ্ডলা" গ্রন্থে কপালকুণ্ডলার অবিসংবাদিত প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানে নবকুমার প্রকৃতির লীলা-সহচর মাত্র। "রোমিও জুলিয়েটে" নায়ক নায়িকা উভয়েই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। "বিষবৃক্ষে"ও সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্র সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। "কৃষ্ণকান্তের উইলে" ভ্রমর

শ্রেষ্ঠ-চরিত্র হইলেও গোবিন্দলালকেই প্রধান চরিত্রের অসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও ইহা ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

কৃষ্ণকান্তের উইল যে ট্রাজিডি পর্য্যায়ের গ্রন্থ ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু এই ট্রাজিডি হইয়াছে কাহার পক্ষে? রোহিণী ও ভ্রমরের পক্ষে কি? প্রথমতঃ আমরা রোহিণীকে লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। জীবনের প্রথমভাগে ব্যর্থতার বিষাদে সংসার তাহার নিকট বিষময় বলিয়া বোধ হইলেও ঘটনাচক্রে সর্ব্বসুখ আয়ত্তাধীন করিয়া সে পরিতৃপ্ত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। অতএব এখানে তাহার পক্ষে ট্রাজিডি হয় নাই। কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া অধিক সুখের আশায় ধাবিত হওয়াতে অব্যবস্থিত-চিত্ততার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে চরম শাস্তি লাভ করিতে হইয়াছে। তাহার এই মৃত্যুকেই ট্রাজিডি বলা যাইতে পারে কি? দুর্য্যোধন ও রাবণের মৃত্যুতে দুষ্কৃতকারি-গণের চরম পরিণতি লক্ষ্য করিয়া আমাদের হৃদয়ে

গভীর ভাবে ব্যথার তরঙ্গ উত্থিত হয় কিনা, ইহা ভাবিয়া দেখিলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলিতে পারে। তারপর ভ্রমরের মৃত্যু। এই সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য একটি প্রশ্ন উত্থাপিত করা হইতেছে। ডেস্‌ডি-মোনার মৃত্যুতে ট্রাজিডি হইয়াছে কাহার পক্ষে? ডেস্‌ডিমোনা যদি প্রকৃতই অপরাধিনী হইত, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুতে ট্রাজিডি হইত না, কিন্তু তাহাকে হত্যা করিয়াই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ওথেলো এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাকেও স্বেচ্ছায় প্রিয়ার অনুগমন করিতে হইল। এই হত্যা ট্রাজিক বা শোকাবহ ঘটনা বটে, কিন্তু তাহাতে যে প্রকৃত ট্রাজিডি হইয়াছে ওথে-লোর পক্ষে, ইহা প্রদর্শন করাই কবির অভিপ্রায়। ভ্রমরও প্রেমের বেদীর মূলে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল ভোগ করিয়া-ছিল গোবিন্দলাল। এই হতভাগ্য মনুষ্যটি সম্বন্ধেই এখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। যে কোন কারণেই হউক, সে রূপের মোহে ছুটিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু তাহার অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল এই যে, রূপের সংস্পর্শে আসিয়াই অতৃপ্তিতে তাহার

হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। অতএব এই মিলনেও ব্যর্থতার বেদনা গোবিন্দলালই অনুভব করিয়াছে। রোহিণীর আলিঙ্গনে শরীর দান করিলেও মনের পরিতৃপ্তি তাহাতে সাধিত হইতে পারে নাই। ইহাই প্রকৃত পক্ষে ট্রাজিডি। তারপর রোহিণীর হত্যার কিছুকাল পরে যখন সে ভ্রমরের নিকট ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও সে দেখিতে পাইল যে, ভ্রমরের প্রত্যাখ্যানে তাহার সেই পন্থাও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে ব্যর্থতার আঘাত পুনঃপুনঃ অনুভব করাতেই তাহার পক্ষে ট্রাজিডি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা তাহার জীবনে কম যন্ত্রণাদায়ক হয় নাই। অবশেষে ভ্রমরের মৃত্যুতে যখন তাহার সকল বন্ধনই ছিন্ন হইয়া গেল,তখন হৃদয়-জ্বালা প্রশমিত করিবার জন্য তাহাকে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল। ভ্রমরের দুঃখ যত গভীরই হউক না কেন, স্বীয় আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সে কখনও অবলম্বনহীন হইতে পারে নাই, এবং তাহারই ফলে সে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু

গোবিন্দলালকে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতে হইয়াছে। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ও ভ্রমরের কৃপাভিক্ষা তাহার দুঃখের বিরাটত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। গ্রন্থকার যাবতীয় ব্যর্থতা ও দুঃখের বোঝা তাহার উপর আরোপিত করিয়া তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ট্রাজিডি গঠিত করিয়া লইয়াছেন। এইভাবে গোবিন্দলালকে এই আখ্যায়িকার মধ্যদণ্ডরূপে গ্রহণ করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। অতএব গোবিন্দলালকেই প্রধান চরিত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ তাহার শোকাবহ পরিণতি প্রদর্শন করাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

গ্রন্থের নামকরণ

গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকার লিখিয়াছেন—"কবেবৃর্ত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা", অর্থাৎ কবির উদ্দিষ্ট ঘটনার নামে, অথবা নায়কের নামে, অথবা অন্য কোন বিষয়ের নামে গ্রন্থের নামকরণ করিতে হয়। অন্যত্র—"নামকার্য্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থপ্রকাশকম্" (ঐ), অর্থাৎ নাটকের অভ্যন্তরে যে অর্থ থাকিবে তাহা প্রকাশ করিতে পারে, এইরূপভাবেও নাটকের নাম দেওয়া যাইতে পারে। নায়ক নায়িকার নাম ব্যতীত কোন বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে গ্রন্থের নামকরণের দৃষ্টান্ত "মৃচ্ছকটিক নাটকে" পাওয়া যায়। গর্ভিতার্থ প্রকাশকের দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমের "বিষবৃক্ষের" উল্লেখ করা যাইতে পারে। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্," বা "মুদ্রারাক্ষসের" নামকরণে নায়কনায়িকার নামের সহিত আখ্যায়িকার গতি পরিবর্ত্তনকারী বস্তুবিশেষের নাম যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এখন "কৃষ্ণকান্তের উইল" নামকরণের সার্থকতা কি আমরা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

এই আখ্যায়িকা কৃষ্ণকান্তের উইলের বিষয় লইয়াই আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম উইলে হর-লালকে সম্পত্তির তিন আনা অংশ দেওয়া হইয়াছিল, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সে পিতার সহিত গর্হিত ব্যবহার করিল। ফলে কৃষ্ণকান্ত উইল পরিবর্ত্তিত করিয়া হরলালের নামে একআনা অংশ লিখিয়া দিলেন। হরলাল কলিকাতা চলিয়া গিয়া ভয় দেখাইল যে, সে বিধবা-বিবাহ করিয়াছে। তখন আবার উইল পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু হর-লালের ভাগে শূন্য পড়িল। ইহাতেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। আখ্যায়িকার প্রথমাংশ এই ভাবে উইল পরিবর্ত্তনের ঘটনা লইয়া রচিত হইয়াছে, এবং পরেও ইহা উইল অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। হরলাল হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া ব্রহ্মানন্দকে এক হাজার টাকা প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া আসল উইলের পরিবর্ত্তে জাল উইল রাখিয়া আসিবার জন্য নিযুক্ত করিল, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ তাহাতে

অকৃতকার্য্য হইলে সে রোহিণীর সাহায্যে কার্য্যোদ্ধারে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহাকে বিবাহ করিতে পারে, এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া হরলাল রোহিণীকে উইল চুরি করিবার জন্য প্ররোচিত করিল। বিবাহের লোভে রোহিণী উইল চুরি করিল বটে, কিন্তু হরলাল তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল না। এইরূপে উইল পরিবর্ত্তিত করিতে আসিয়াই রোহিণীর হৃদয়ে ভোগতৃষ্ণা জাগরিত করিয়া হরলাল মহা অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিল। ইহারই প্রভাবে চালিত হইয়া রোহিণী আত্মতৃপ্তির জন্য গোবিন্দলালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। পরে গোবিন্দলালের মঙ্গলার্থে পুনরায় উইল পরিবর্ত্তিত করিতে যাইয়া সে ধরা পড়ে, এবং উদ্ধারকর্ত্তা গোবিন্দলালের নিকট স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এইরূপে প্রেম-নিবেদন করিয়াও যখন দেখিল যে তাহাতে গোবিন্দলাল বিচলিত হয় নাই, তখন এই ব্যর্থতার আঘাত আর সে সহ্য করিতে পারে নাই। ইহারই ফলে সে বারুণী পুষ্করিণীতে

ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল। এই সময়ে তাহাকে উদ্ধার করিবার কালে তাহার নগ্ন সৌন্দর্য্যের সম্মুখীন হইয়া গোবিন্দলালের হৃদয় তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, হরলালকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া যে উইল করা হইয়াছিল, তাহারই প্রভাব ঘটনা-পরম্পরায় রোহিণীকে অবলম্বন করিয়া গোবিন্দলাল্ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বারুণী পুষ্করিণী হইতে রোহিণীকে উদ্ধার করিবার ঘটনা লইয়াই গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মধ্যে প্রথম বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপে গোবিন্দলাল, রোহিণী ও ভ্রমর এই তিন জনই ক্রমে ক্রমে ঐ উইলের আবর্ত্তে জড়ীভূত হইয়া পড়িল। এখানেই উইলের প্রথমপর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছে।

ইহার দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে কৃষ্ণকান্ত কর্ত্তৃক গোবিন্দলালের সম্পত্তি ভ্রমরের নামে লিখিয়া দেওয়ার সময় হইতে। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াও হয়ত গোবিন্দলাল দেশেই থাকিয়া যাইত, এবং তাহাতে তাহার সংশোধনেরও সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ঐ উইলের জন্য আত্মাভিমানে-

সে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের মঙ্গলের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, তাহাই প্রকারান্তরে তাহার দুর্দ্দশার কারণ হইয়া পড়িল। এখন এই উইল স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিবার কালে গোবিন্দলাল ইহা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহাকে ব্যথিত করিয়া গিয়াছে, আবার ভ্রমরও ইহার বিষময় ফল কল্পনা করিয়া স্বামীর নামে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও সে গোবিন্দ-লালকে তাহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। রোহিণীর নব প্রণয়ের আকর্ষণের সহিত উইলের অনিষ্টকারিতা যুক্ত হইয়া গোবিন্দলালকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিল। পরে রোহিণীর প্রভাব হইতে সে নিজেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু এই উইলের প্রভাব সে আর জীবনে কখনও অতিক্রম করিতে পারে নাই। প্রসাদ-পুরে নিশাকরের নিকট সম্পত্তি হস্তান্তরের কথা শুনিয়া সে বলিয়াছিল—"বিষয় আমার স্ত্রীর, আমার নহে, তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা পত্তনি দিবেন

আমার বিধিনিষেধ নাই।" রোহিণীর হত্যার পরে যখন সে ভ্রমরের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিল তখনও সে লিখিয়াছিল—"তুমি বিষয়াধিকারিণী,—বাড়ী তোমার—আমায় তুমি স্থান দিবে কি?" যখন রোহিণী নাই, তখনও উইল রহিয়াছে। জীবনে সম্পত্তি ভোগ করা আর গোবিন্দলালের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। এই ভাবে দ্বিতীয়পর্ব্বেও এই উইল আখ্যায়িকার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ইহাকে শোচনীয় পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। অতএব "কৃষ্ণকান্তের উইল" নামকরণের পূর্ণ সার্থকতা বর্ত্তমান রহিয়াছে।[১]

১। এই সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" ১৭৯—১৮০ পৃঃ, এবং শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয়ের "বঙ্কিমচন্দ্র", ১৮৩—১৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অভিমান

এই গ্রন্থের নাম "কৃষ্ণকান্তের উইলের" পরিবর্ত্তে "অভিমান" রাখিলেও অসঙ্গত হইত না। অভিমানের প্রাণ গর্ব্ব, এবং ক্রোধে ইহার অভিব্যক্তি। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ইহার লীলাখেলা চলিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের প্রথম উইলে হরলালকে সম্পত্তির তিন আনা অংশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে হরলাল আসিয়া পিতার সহিত বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইল। ফলে কৃষ্ণকান্ত উইল পরিবর্ত্তিত করিয়া হরলালের জন্য এক আনা অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ইহাতে অভিমান করিয়া হরলাল কলিকাতায় চলিয়া গেল, এবং পিতাকে লিখিয়া জানাইল যে, তাহাকে আট আনা অংশ না দিলে সে বিধবা বিবাহ করিবে। ইহার কিছুকাল পরেই বিধবা বিবাহ করিয়াছে বলিয়া সে পিতাকে সংবাদ পাঠাইল। কৃষ্ণকান্ত আবার উইল পরিবর্ত্তিত করিলেন। তাহাতে হরলালের ভাগে শূন্য পড়িল,

কিন্তু তাহার শিশুপুত্র এক পাই অংশের অধিকারী হইল।

গ্রন্থের এই প্রস্তাবনাতেই আমরা অভিমানের লীলাখেলা প্রত্যক্ষ করিতেছি। পিতার ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া অভিমান বশতঃ হরলাল বিধবা বিবাহের ভয় প্রদর্শন করিল, আর বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত হরলালের দোষে তাহার শিশুপুত্রের অনিষ্ট সাধন করিলেন। অপরিপক্কবুদ্ধি হরলালের অপরাধ মার্জ্জনীয় হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধ কৃষ্ণ-কান্তকে কিছুতেই অবিবেচনার দায় হইতে মুক্তি দিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা পরবর্ত্তী ঘটনার সঙ্কেত মাত্র। সুদক্ষ গ্রন্থকারগণ এইভাবে প্রস্তা-বনাতেই ভবিষ্যতের ছায়াপাত করিয়া থাকেন। ইহার ফলে প্রথমেই ভারাক্রান্ত চিত্ত লইয়া আমা-দিগকে গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিতে হইতেছে। ইহার পরে একটু ক্ষুদ্র অভিমানের পালা। কার্য্যসিদ্ধির পরে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় রোহিণী হরলালকে ঝাঁটা দেখাইয়া বিদায় করিবার কালে বলিয়াছিল—"তোমার মত নীচ, শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই।" প্রত্যাখ্যান ও চুরির

অপবাদের ফলে তাহার আত্মমর্য্যাদায় যে আঘাত আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে অভিমান-বশে সে হরলালকে দংশন করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। হরলালের এই ব্যবহারই গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হইবার পটভূমির সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল।

গ্রন্থের অতি ক্ষুদ্র চরিত্রও অভিমানবশে আখ্যায়িকাকে পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা ক্ষীরি চাকরাণীর কথাই বলিতেছি। স্বামীর নিন্দা শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া অভিমানবশতঃ ভ্রমর ক্ষীরিকে অপমানিত করিয়াছিল, আবার ভ্রমরের নিকট কিলচড় লাভ করিয়া অভিমানবশে সে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর প্রণয়ের কাল্পনিক কাহিনী চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিয়া দিয়াছে। স্বামীর কুৎসা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ভ্রমরের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। রোহিণীও ইহা শুনিয়া ভাবিল যে, ভ্রমর তাহার অপবাদ রটাইয়াছে। অতএব ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অভিমানবশে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য সে ধার করা গহনা দেখাইয়া ভ্রমরের নিকটে

মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করিয়া গেল। ফলে গোবিন্দলালকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া অভিমানের উত্তেজনায় ভ্রমর স্বামীকে কঠোর পত্র লিখিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল। এইরূপে একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ হইতে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।

এখন গোবিন্দলালের পালা। ভ্রমর তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া গোবিন্দলাল অভিমানে ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিল। এদিকে লোকপরম্পরায় গোবিন্দলালের চরিত্রহীনতার সংবাদ অবগত হইয়া সত্য নির্ণয়ের কোন চেষ্টা না করিয়াই বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের সম্পত্তি ভ্রমরের নামে লিখিয়া দিলেন। ইহা স্নেহের নির্ম্মম অভিমান। হরলালের প্রতি তিনি ইহার পূর্ব্বে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এখন গোবিন্দলালও তাহা হইতে মুক্তি পাইল না। উভয়ের ভাগেই শূন্য পড়িয়া গেল। আবার বধূর নামে সম্পত্তি হইল দেখিয়া গোবিন্দলালের মাতাও অভিমানে কাশী চলিয়া গেলেন। ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার

কালে গোবিন্দলালের চিত্ত বিচলিত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু অভিমান আসিয়া তাহা সুদৃঢ় করিয়া দিল। ফলে সে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। এইরূপে রায়-পরিবার ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধে আমরা কেবল অভিমানের লীলা-খেলাই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ইহার শেষার্দ্ধেও অভিমান সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। রোহিণীর জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল বলিয়া রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে গোবিন্দলালের মনে প্রবল অভিমানের উদয় হইয়াছিল। ইহারই অভিব্যক্তি ক্রোধে। গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিয়া বসিল। তারপর আত্মমর্য্যাদাভিমানে আর ভ্রমর গোবিন্দলালকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পিতাপুত্রের, চাকর-চাকরাণীর, স্বামী-স্ত্রীর ও প্রেমিক-প্রেমিকার অভিমানে এই আখ্যায়িকাকে শোচনীয় পরিণতির দিকে চালিত করিয়াছে। ইহাতে অভিমানের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হই। "রোমিও জুলিয়েট"কে যেমন

কৃষ্ণকান্তের উইল

প্রেমের ট্রাজিডি, "ওথেলো"কে প্রণয়ের প্রতি সন্দেহের ট্রাজিডি বলা হয়, সেইরূপ "কৃষ্ণকান্তের উইলকে"ও অভিমানের ট্রাজিডি বলা যাইতে পারে।

ট্রাজিডি-সংঘটনকারিগণ

১। হরলাল

হরলালের পরিচয়-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন —"হরলাল বড় দুর্দ্দান্ত, পিতার অবাধ্য এবং দুর্মুখ।" ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি গ্রন্থমধ্যে তাহাকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহারই প্রতিচ্ছবি স্বল্পায়তনে এখানে প্রদত্ত হইল। উইলে তাহাকে সম্পত্তির তিন আনা অংশ দেওয়া হইয়াছে জানিতে পারিয়া সে "ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল—এটা কি হইল? গোবিন্দলাল অর্দ্ধেক ভাগ পাইল, আর আমার তিন আনা?" ইহা দ্বারা গ্রন্থের প্রারম্ভেই বঙ্কিম উইল-ঘটিত ব্যাপারে বিরোধের সৃষ্টি করিয়া পাঠকগণকে উৎকণ্ঠিত করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পরে হরলালের ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া কৃষ্ণকান্ত উইল পরিবর্ত্তিত করিয়া হরলালকে এক আনা অংশ মাত্র প্রদান করিলেন। হরলাল রাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল, এবং তথা হইতে পিতাকে

পত্র লিখিয়া জানাইল যে, তাহাকে আট আনা অংশ না দিলে সে বিধবা বিবাহ করিবে। হরলাল পূর্ব্বেও বিবাহ করিয়াছিল, এবং তাহার একটি পুত্রেরও সন্ধান গ্রন্থে মিলিতেছে, কিন্তু সে এখন বিপত্নীক, তাই বিধবা বিবাহ করিয়া সে পিতার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার ভয় দেখাইয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত ইহার উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, হরলাল বিধবা বিবাহ করিলে পুনরায় উইল পরিবর্ত্তিত হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না। ইহাতেও হরলাল ভীত না হইয়া পিতাকে জানাইল যে, সে বিধবা বিবাহ করিয়াছে। ইহার ফলে কৃষ্ণকান্ত হরলালকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া উইল পরিবর্ত্তিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন। এই সংবাদ হরলালের নিকটও অবিদিত ছিল না। ভয় প্রদর্শনে পিতাকে বিচলিত করিতে না পারিয়া হরলাল দেশে আসিয়া কৌশলে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য গোপনে ব্রহ্মানন্দের দ্বারা জাল উইল প্রস্তুত করাইল, এবং হাজার টাকার লোভ দেখাইয়া তাহাকে আসল উইলের পরিবর্ত্তে জাল উইল

রাখিয়া আসিবার জন্য প্ররোচিত করিল, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অবশেষে হরলাল রোহিণীকেও বিবাহ করিতে পারে, ইহা আভাসে জানাইয়া তাহাকে উইল চুরি করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিল। এখান হইতেই প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে।

বাল বিধবা রোহিণী সুন্দর যুবতী হইলেও ব্রহ্মানন্দের সংসারে আশ্রয় লাভ করিয়া কোন প্রকারে বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করিতেছিল। তাহার হৃদয়ে যে প্রবল আসঙ্গলিপ্সা অবস্থান করিতেছিল তাহা এই উইল চুরির ব্যাপারে আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু হরলাল আসিয়াই তাহার সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছে, অর্থাৎ তাহাকে অভিনয়ের উপযোগী জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে! হরলালের উদ্দেশ্য ছিল, গোবিন্দলালকে সম্পত্তির ন্যায্য অংশ প্রদান না করা। তাহাতে আপাততঃ অকৃতকার্য্য হইলেও রোহিণীর হৃদয়ে কামনার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সে যে অনিষ্টের বীজ রোপন করিয়া গেল তাহারই পরিণতিতে গোবিন্দলালের সর্ব্বনাশ সাধিত

হইয়াছিল। কারণ হরলাল কর্ত্তৃক প্রজ্জ্বলিত দীপ-শিখার অগ্নিই গোবিন্দলালকে গ্রাস করিয়াছে। এইভাবে গোলকের আবর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিয়া সে এক সুখের সংসার ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল।

পিতার সহিত ব্যবহারে তাহার অবাধ্যতা ও স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। জাল উইল প্রস্তুত করান, ও তাহাতে দস্তখত করিবার ব্যাপারে আমরা বুঝিতে পারি যে, নিজ স্বার্থের জন্য কোন কার্য্যই সে নিন্দনীয় মনে করে নাই। অতএব তাহার পক্ষে রোহিণীকে মিথ্যা প্রলোভনে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিযুক্ত করা, এবং কার্য্য-উদ্ধারের পরে তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করা আস্বাভাবিক হয় নাই। রোহিণীকে সে যে বিবাহ করিতে পারে বলিয়াছিল তাহাতে আন্তরিকতা ছিল না, কারণ ইহা তাহার মুখের কথা মাত্র, প্রাণের কথা নহে। অতএব তদনুযায়ী কার্য্য করাও সে সঙ্গত মনে করে নাই। বরং রোহিণীর পক্ষেই তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ হেয় কার্য্যে আত্মনিয়োগ

করিলেও রোহিণী যখন বিবাহের দাবী করিয়া বসিল, তখন আত্মমর্য্যাদা-বোধের বশবর্ত্তী হইয়া সে বলিয়াছিল—"আমি যাই হই, কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।" গ্রন্থকার গোবিন্দলালের নিকট রোহিণীকে বাহ্যিক রূপের আবরণে মণ্ডিত করিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। সে প্রথমতঃ তাহার অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে কোনই ধারণা করিতে পারে নাই, তাই তাহার রূপে এবং ভালবাসার অভিনয়ে প্রতারিত হইয়াছিল। কিন্তু হরলাল প্রথমেই তাহার অন্তরের পরিচয় লাভ করিয়া ঘৃণার সহিত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যে উইলের জন্য সে এত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, হাতের নিকটে পাইয়াও তাহা হস্তগত করিবার জন্য সে রোহিণীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। সে স্পষ্টই বলিয়াছিল—"আমি জাল করি, চুরি করি, আপনারই হকের জন্য। তুমি চুরি করিয়াছ, কার হকের জন্য?" বস্তুতঃ নিজের স্বার্থ-সম্বন্ধে সে এতটাই সজাগ ছিল বলিয়া নীচ-প্রকৃতি রোহিণীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে নাই।

কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির লোক কেবল যে অন্যেরই অনিষ্ট সাধন করে তাহা নহে, তাহাতে তাহাদের নিজেরও অনিষ্ট সাধিত হয়। হরলালের ঔদ্ধত্যে রাগান্বিত হইয়া কৃষ্ণকান্ত তাহাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলেন, এমন কি তাহার নাবালক পুত্রের জন্য সম্পত্তির মাত্র নগণ্য অংশের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ইহাতে দেখা যায়, দুষ্প্রবৃত্তির জন্য হরলাল কেবল যে নিজেরই অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল তাহা নহে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের ন্যায্য অধিকার হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার কারণ স্বরূপ হইয়াছিল।

ইহার পরে কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধের সময়ে আমরা আর একবার মাত্র হরলালের সাক্ষাৎ লাভ করি। পিতা কর্ত্তৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াও সে যে শ্রাদ্ধের সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় তখনও সে সম্পত্তির আশা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কিন্তু শ্রাদ্ধের পরে উইল লইয়া কোন প্রকার গোলমাল করিয়া লাভ হইবে না দেখিয়া সে সরিয়া পড়িয়াছে। ইহাও বরং মন্দের ভাল, কারণ সে ইচ্ছা করিলেই শ্রাদ্ধ করিতে অস্বীকৃত

হইতে পারিত, অথবা উইল লইয়া মোকদ্দমার সৃষ্টি করিতে পারিত, কিন্তু গ্রন্থকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহার চরিত্রে মসীলেপন করেন নাই।

২। মাধবীনাথ

মাধবীনাথ ভ্রমরের পিতা, রাজগ্রামে তাঁহার বাস। তাঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"মাধবীনাথ সরকারের বয়স এক-চত্বারিংশৎ বৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোক মধ্যে বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত—অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্টলোক আর নাই। তিনি যে চতুর তাহা সকলেই স্বীকার করিত—এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।" অর্থাৎ মাধবীনাথ যে অত্যন্ত ধূর্ত্ত এবং প্রতাপশালী ছিলেন, তাহার নির্দ্দেশ এইভাবে প্রদান করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার অভিনয়ের ভূমিকা গঠিত করিয়া লইয়াছেন।

গোবিন্দলাল বন্দরখালি হইতে দেশে আসি-তেছে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া যখন ভ্রমর

পীড়ার ভাণ করিয়া মাতাকে পত্র লিখিল, তখনই মাধবীনাথের সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"যদি মা না হইয়া আর কেহ হইত, তবে ভ্রমরের পত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিত যে, ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে। কিন্তু মা সন্তানের পীড়ার কথা শুনিয়া একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন।" ফলে তিনি স্বামীকে কিছু গালি দিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া ভ্রমরকে আনাই-বার বন্দোবস্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। মাধবীনাথ ভ্রমরের পীড়ার কথা না লিখিয়া কৃষ্ণকান্তকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"ভ্রমরের মাতা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন, ভ্রমরকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন।" ভ্রমরের এই সময়ে পিতৃগৃহে আগমনেই গোবিন্দলালের সহিত তাহার বিচ্ছে-দের সূচনা হইয়াছিল।

মাধবীনাথ চতুর হইলেও একদিকে পত্নীর গঞ্জনা ও অশ্রুজল, অপরদিকে সন্তান-স্নেহ, এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণকান্তকে পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা সংসারের নিত্যনৈমি-ত্তিক ঘটনা মাত্র। এমন সময় আসে যখন চেষ্টা

করিয়াও আমরা বুদ্ধির প্রভাবে চালিত হইতে পারিনা। ভ্রমরের পত্রে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হরিদ্রাগ্রামে ভ্রমরের হয়ত কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব স্নেহের প্রেরণায় মাধবীনাথ তাহাকে আনাইবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিয়া থাকিবেন। এই সকল সামান্য ঘটনা হইতে যে ভবিষ্যতে মহা অনিষ্টের সূত্রপাত হইতে পারে, তাহা কল্পনা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিন না। কিন্তু ভ্রমরের এই আগমনেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য মাধবীনাথকে পরোক্ষভাবে দায়ী করা যাইতে পারে। পত্নীর চক্ষের জলে বিচলিত না হইয়া তিনি যদি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে হয়ত এই জটিলতার সমাধানের অন্য কোন উপায়ও আবিষ্কৃত হইতে পারিত। কিন্তু মানুষের কার্য্য সব সময় সুফল প্রসব করে না। মাধবীনাথের এই ভুলই ভ্রমরের সর্ব্বনাশের সূচনা করিয়া দিয়াছিল।

তারপর কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধের সময়ে আসিয়া যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, উইল লইয়া কন্যা-

জামাতার মধ্যে মনোবাদের সৃষ্টি হইতে পারে, তখন তিনি কন্যাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, গোবিন্দলালের পিতার সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী গোবিন্দলাল। অতএব কৃষ্ণকান্তের উইল অসিদ্ধ। ইহার পরে ভ্রমরকে রাজগ্রামে লইয়া যাইয়া গোবিন্দলালের নামে এক দানপত্রও তিনি রেজেষ্টারী করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার সুবিবেচনারই পরিচয় পাওয়া যায়। মাধবীনাথ প্রকৃতই বুঝিয়া ছিলেন যে, কন্যা প্রিয় হইলেও কন্যা অপেক্ষা জামাতা বড়, কারণ কন্যার সুখসম্পদ্ জামাতার প্রীতির উপরেই নির্ভর করে। এইজন্য তিনি সাধ্যানুযায়ী তাহাদের মধ্যে সম্ভাব রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিন্তু মাধবীনাথের কর্ম্মশক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যখন কন্যার পীড়ার সংবাদে তিনি হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া দেখিলেন—"সেই শ্যামাসুন্দরী, যাহার সর্ব্বাবয়ব সুললিত গঠন ছিল—এক্ষণে বিশুষ্কবদন, শীর্ণ-শরীর, প্রকট-কণ্ঠাস্থি, নিমগ্ননয়নেন্দীবর।" দেখিয়া তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি

বহির্ব্বাটীতে আসিয়া রোদন করিয়াছিলেন, কারণ ভ্রমর দেখিতে পাইলে আরও বিহ্বল হইয়া পড়িত। "কেবল রোদন নহে—সেই মর্ম্মভেদী দুঃখে মাধবীনাথের হৃদয় ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'যে আমার কন্যার উপর এ অত্যাচার করিয়াছে—তাহার উপর তেমনি অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেহ নাই?' ভাবিতে ভাবিতে মাধবীনাথের হৃদয় কাতরতার পরিবর্ত্তে ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইল। মাধবীনাথ তখন রক্তোৎফুল্ললোচনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—যে আমার ভ্রমরের এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আমি তাহার এমনি সর্ব্বনাশ করিব।" এখানেই মাধবীনাথের চরিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অভিনয়ের সূচনা।

এখানেও মাধবীনাথ ভুল করিয়া বসিয়াছেন। প্রতিশোধ বাসনায় তিনি উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। শত হইলেও গোবিন্দলাল তাঁহার পুত্রস্থানীয়। অপরাধের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি হৃদয়ে স্থান দান করিয়া তিনি পিতৃত্বের পর্য্যায়

10—O. P. 64

হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়াছেন। গোবিন্দলালকে শাসন করা যাইতে পারে, কিন্তু শ্বশুরের পক্ষে তাহারও সীমা আছে, কারণ কন্যা মধ্যবর্ত্তিনী। এই অবস্থায় তাহার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প যেন কুচিকিৎসকের ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করার মত অবিবেচনার কার্য্য। এখানেই বুঝা যাইতেছে যে, এই উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কোন প্রচণ্ড আঘাতের পরিকল্পনা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। সকলে এইরূপে তিল তিল করিয়া গতিবেগ সঞ্চারিত না করিলে আখ্যায়িকা শোচনীয় পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিতনা।

তারপর যে ভাবে তিনি পোষ্টমাষ্টারের নিকট হইতে গোবিন্দলালের বাসস্থানের সন্ধান জানিয়া পুলিশের সাহায্যে ব্রহ্মানন্দকে ভয় দেখাইয়া নিজের কার্যোদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে তাহার কৌশলেরই পরিচয় পাওয়া যায়। অবশেষে ভ্রমরের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি নিশাকর সহ প্রসাদপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আত্মগোপন করিয়া নেপথ্যে থাকিয়া তিনি

নিশাকর দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিয়াছেন। ফলে রোহিণীকে হত্যা করিয়া গোবিন্দলাল পলাইয়াছে। মাধবীনাথের মনে প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনা জাগরিত হইয়াছিল, তিনি নিক্তির ওজনেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কাহারও মঙ্গল সাধিত হয় নাই। না হইবারই কথা, কারণ গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, ভ্রমরের মঙ্গলার্থে মাধবীনাথ কার্য্যে ব্রতী হন নাই, বরং তাহার প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছিল তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অতএব উদ্দেশ্য অনুযায়ী তিনি ফললাভ করিয়াছেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গ্রন্থকার মাধবীনাথকে চতুর ও প্রতিপত্তিশালী করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন, তাঁহার স্থিরবুদ্ধির উল্লেখ করেন নাই। কার্য্যেও তিনি তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নিজের মতলব মতই তিনি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফলভোগী হইয়াছে গোবিন্দলাল, রোহিণী ও ভ্রমর। রোহিণীর হত্যার জন্যই গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছিল।

মাধবীনাথের কর্ম্মশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় গোবিন্দলালের বিচারের সময়। সাক্ষিগণকে টাকা দ্বারা বশীভূত করিয়া তিনি গোবিন্দলালকে খুনের দায় হইতে মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার চতুরতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বটে, কিন্তু এই সময়েই স্থির বুদ্ধির অভাবে তিনি সব পণ্ড করিয়া দিয়াছেন। বিচারালয় হইতে যখন গোবিন্দলাল মুক্তির জন্য জেলখানায় যাইতেছিল, তখন তিনি তাহার কানে কানে বলিয়া দিলেন—"জেল হইতে খালাস পাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আমার বাস, অমুক স্থান।" ইহা অপেক্ষা অবিবেচনার কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। গোবিন্দলালের সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া তিনি ইহাও কি ধারণা করিতে পারেন নাই যে, তখন তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত নয়? বস্তুতঃ তাঁহার এই অবহেলাতেই গোবিন্দলাল পুনরায় পলাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল, এবং তিনি একাই গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ-লালের এই পলায়নে ভ্রমরের হৃদয়েও যে মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে

পারে। এখানেও মাধবীনাথ পরোক্ষভাবে ভ্রমরের মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কন্যা-জামাতার মিলনের এই অত্যুৎকৃষ্ট সুযোগ হেলায় নষ্ট করিয়া তিনি আখ্যায়িকাকে ট্রাজিডিতে পরিণত করিয়াছেন। ভ্রমরের দুর্দ্দশার জন্য মাধবীনাথের দায়িত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

৩। কৃষ্ণকান্ত

গ্রন্থকার কৃষ্ণকান্তকে ন্যায়পরায়ণ বৃদ্ধরূপে গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করাইলেও তাঁহাকে দোষবিবর্জ্জিত করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তিনি ছিলেন অভিমানী, অনাবশ্যকরূপে কঠোর, এবং স্বৈরাচারের স্বভাব-শিষ্ট। এজন্য তাঁহাকে অভ্রান্তরূপে পাইবার সুযোগ আমরা লাভ করিতে পারি নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরলাল দুর্দ্দান্ত এবং দুর্ম্মুখ। পিতার সহিত উইল লইয়া সে অবিনীত ব্যবহার করিয়াছিল। অমনি কৃষ্ণকান্ত "স্বহস্তে উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তৎপারবর্ত্তে নূতন একখানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে···হরলাল এক আনা মাত্র পাইলেন।" পুত্রকে সৎপথে আনিবার জন্য শাসন করা যায়

বটে, কিন্তু এইভাবে তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় করিয়া দেওয়া যে নির্ম্মম কঠোরতার পরিচায়ক তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার পরে পিতা-পুত্র উভয়েই পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত জমিদার, স্বোপার্জ্জিত বিষয় ভোগ করিতেছিলেন, অতএব তাঁহার আত্মাভিমান থাকা অস্বাভাবিক নহে। অপরদিকে হরলালও জমিদারের পুত্র, পিতার কিছু বিশেষত্ব তাহার মধ্যে বর্ত্তমান থাকাও স্বাভাবিক। অতএব সে পিতার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে নাই। ইহাতে কৃষ্ণকান্তেরই প্রতিমূর্ত্তি হরলালে আংশিক প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

তারপর হরলাল বিধবা বিবাহ করিয়াছে এই সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণকান্ত তাহাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলেন, এবং বিনোদলালের অনুরোধ সত্ত্বেও হরলালের পুত্রকে মাত্র এক পাই অংশ প্রদান করিয়া নূতন উইল সম্পাদিত করিলেন। ইহা তাঁহার স্বৈরাচারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অনেক পিতা পুত্রকে দেখিতে পারেন না, কিন্তু এমন পিতামহ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি পৌত্রের

প্রতি স্নেহশীল নহেন। বিশেষতঃ মাতৃহারা এই শিশুটির স্বার্থের প্রতি কৃষ্ণকান্তের সতর্ক দৃষ্টি থাকাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু স্নেহের তারল্য তাঁহার অনাবশ্যক কঠোরতার আবরণ সিক্ত করিতে পারে নাই। বাঘ-মহিষের যুদ্ধে নলবনের দফা শেষ হয়, ইহা একরূপ প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। এখানে আমরা অনুরূপ ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু ডেপুটি-মাজিষ্ট্রেট বঙ্কিম এখানেও আইন বাচাইয়া কার্য্য করিয়াছেন। বিষয়টি কৃষ্ণকান্তের স্বোপার্জ্জিত, পৈত্রিক নহে, অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু আমরা কি করিতে পারি, এই নীতির উপরে মানব-সমাজ গঠিত হয় নাই, আমাদের কি করা উচিত ইহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অভিমানের উত্তেজনায় কৃষ্ণকান্ত ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন। এইভাবে দোষেগুণে গঠিত করিয়া বঙ্কিম তাঁহাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার চরিত্রের ভূমিকা মাত্র। মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল পরিবর্ত্তিত করিয়া তিনি যে অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহারই

পটভূমি রূপে এই ভাবে কৃষ্ণকান্তকে চিত্রিত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত অহিফেম সেবন করিতেন। তাহারই নেশায় অভিভূত থাকার অবস্থায় রোহিণী তাঁহার ঘর হইতে উইল চুরি করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার চুরি করিতে আসিয়া কৃষ্ণকান্তের সতর্কতার নিকটে সে ধরা পড়িয়াছে। কাছারীঘরে তাহার বিচার হইতেছিল, এমন সময়ে গোবিন্দলাল জামিন হইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া আনিল। এই সময়ে গোবিন্দলালের প্রতি ব্যবহারে দেখা যায় যে, তিনি তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। গোবিন্দলালের গুণ ছিল বলিয়াই সে পিতৃব্যের স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও আমরা দেখিতেছি যে, কৃষ্ণকান্ত গুণের সমাদর করিতে জানিতেন। অপর পক্ষে হরলালের ন্যায় গুনহীন পুত্রের নিকট তিনি নির্ম্মম বিধাতা। নিজের চেষ্টায় যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন, ইহা তাঁহাদের চরিত্রের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব।

এইভাবে কৃষ্ণকান্তকে গঠিত করিয়া গ্রন্থকার তাঁহাকে ট্রাজিডির সাহায্যকারীরূপে দাঁড়

করাইয়াছেন। গোবিন্দলালের অংশ ভ্রমরের নামে লিখিয়া দিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে উইল করিয়াছিলেন, তাহাতেই আখ্যায়িকা শোচনীয় পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দলালের অপবাদের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিবারও সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, অথচ উইল করিয়া যাবতীয় সম্পত্তি ভ্রমরের নামে লিখিয়া দিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, গোবিন্দলালকে ভ্রমরের অঞ্চলে বাঁধিয়া দেওয়ার ইহাই ছিল প্রকৃষ্ট উপায়। তাঁহার সেই অন্তিম সময়ে এইভাবে উইল পরিবর্ত্তিত করা ভিন্ন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের যে অন্য কোন সহজ উপায় ছিল না, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, আর গোবিন্দলালকে এইভাবে শাস্তি প্রদানের অধিকারও তাঁহার ছিল, কারণ তিনি নিজের পুত্রের প্রতিও অমোঘ দণ্ড প্রদান করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। জন্মগত অধিকার লইয়া পুত্র বা প্রিয়জনের দাবীতে কেহ তাঁহার নিকট হইতে

অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। কর্ত্তব্যের যে উচ্চ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মৃত ভ্রাতার প্রাপ্য অর্দ্ধেক সম্পত্তি দুর্ব্বলতা এবং শত বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়াও ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন, হরলালকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতেও কাতর হন নাই, তাহারই প্রভাবে পরিচালিত হইয়া তিনি অবশেষে গোবিন্দলালের প্রতি এই শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন গুণীর বন্ধু, এবং নির্গুণের যম। স্নেহ-মমতার দালালীতে তিনি অনুমাত্রও বিচলিত হন নাই। এখানে তিনি ভ্রমরের সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন। কিন্তু কল্যাণ-কামনায় তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাই ধ্বংসের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। ইহাই প্রকৃত ট্রাজিডি।

গোবিন্দলালের তখন সঙ্কটময় অবস্থা। রোহিণীর দিকে সে ঢলিয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু গৃহত্যাগ করিবার কল্পনা তখনও তাহার মনে উদিত হয় নাই। এই উইল তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ক্ষণিক উত্তেজনা বশে সে যাহাই করুক না কেন, হরিদ্রাগ্রামে থাকিলে

তাহার সংশোধনের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইত না। কিন্তু উইলের ফলেই তাহার সহিত ভ্রমরের চিরবিচ্ছেদের সূচনা হইয়া গেল। কৃষ্ণকান্ত প্রকারান্তরে ইহাই অনুষ্ঠিত করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।[১]

সমাপ্ত

---

১ বিষয়-বিভাগে আলোচনা করাতে স্থানে স্থানে একই ঘটনার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিতে হইয়াছে। প্রশ্নোত্তরের আদর্শ অনুসরণ করাতে ইহার ব্যতিক্রম সম্ভবপর হয় নাই।

গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনা

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)

১। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী—১ম ও ২য় খণ্ড।

২। সহজিয়া সাহিত্য

৩। Post-Caitanya Sahajiyā cult of Bengal.

৪। রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা (আর্ট জার্নেলে প্রকাশিত)।

৫। Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vols. II & III.

৬। An Introduction to the Study of the Post-Caitanya Sahajiyā cult (Published in the Journal of the Department of Letters. Vol. XVI.)

[*Published by the Pali Text Society of England.*]

Itivuttaka—Vaṇṇanā Vols I & II